গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৮ বর্ষ ২ সংখ্যা ৫ - ১১ আগস্ট, ২০০৫ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

"ভারতবর্ষে ব্যক্তির বিকাশের কথা হোক, কল্যাণের কথা হোক, পারিবারিক কল্যাণের প্রশ্ন হোক, অগ্রগতি ও উন্নতির প্রশ্ন হোক — আর্থিক, সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকের অধোগতি থেকে যদি ব্যক্তিকে, পরিবারগুলোকে, পারিবারিক সম্পর্ককে, স্নেহ-প্রীতি-মমতা, মানুষের মূল্যবোধ, রুচিসংস্কৃতি এমনকী বিজ্ঞানসাধনাকে — অর্থাৎ এককথায় গোটা দেশকে বাঁচাতে হয়, পরিবর্তিত করতে হয়, তাহলে বিপ্লব ছাড়া গত্যন্তর নেই। আর আমাদের দেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে সেই বিপ্লব হচ্ছে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।"

শিবদাস ঘোষ

৫ই আগস্টের সংকল্প

নীহার মুখার্জী

আগামী ৫ আগস্ট আমাদের দল এস ইউ সি আই-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক, এযুগের অন্যতম অগ্রণী মার্কসবাদী দার্শনিক ও চিন্তানায়ক, আমাদের শিক্ষক ও পথপ্রদর্শক কমরেড শিবদাস ঘোষের ২৯তম মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হতে চলেছে। এই দিনটির গভীর তাৎপর্য বিশেষ করে আজকের দিনে আমাদের সকলকেই বুঝে নিতে হবে। এদেশে সর্বহারাশ্রেণীর একটি সত্যিকারের বিপ্লবী দল গড়ে তোলা এবং বিপ্লবী সংগ্রামগুলি পরিচালনা করার জীবনব্যাপী কঠোর ও কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যে অমূল্য শিক্ষাগুলো তিনি আহরণ করেছেন এবং আমাদের সামনে রেখে গেছেন, তাঁর সেই শিক্ষাগুলোকে আমাদের সকলকে শুধু আয়ত্ত করাই নয়, এমন করে আত্মস্থ করতে হবে — যাতে আমরা দেহে, মনে, রুচি-সংস্কৃতিতে ও আচার-আচরণে সর্বদিক থেকে নিজেদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে পারি।

আমরা সকলেই জানি, কমরেড শিবদাস ঘোষ আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনে লেনিন পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষাগুলোকে এদেশের মাটিতে বিশেষীকৃত করতে গিয়ে অধিকতর বিকশিত ও সমৃদ্ধ করেছেন শুধু নয়, আরও কিছু বিষয় সংযোজিত করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ধ্যানধারণাগুলোকে এক উন্নত পর্যায়ে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। একেই আমরা বলি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারা — যেটা ছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রের কোন সমস্যাকেই বর্তমান কালে সঠিকভাবে বিশ্লেষণ করা, তার ওপর আলোকপাত করা ও সমাধান করা সম্ভব নয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের এমন কোন শাখা নেই যেখানে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেন নি। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্য, নীতিনৈতিকতা থেকে শুরু করে আধুনিক বিজ্ঞানের সমস্ত জটিল সমস্যাকে তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত জ্ঞানের আলোকে তিনি উদ্‌ভাসিত করেছেন। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের জটিল বিষয়গুলোকেও সকলের কাছে তিনি এমনভাবে তুলে ধরেছেন, যা অল্পশিক্ষিত বা এমনকী অশিক্ষিত চাষী মজুরের কাছেও জলের মত পরিষ্কার ও প্রাঞ্জল হয়ে উঠেছে। তিনি একথা পরিষ্কারভাবে বুঝেছিলেন যে, ভারতবর্ষের মত একটা পিছিয়ে-পড়া দেশে যদি আপামর জনসাধারণ ও ব্যাপক চাষী-মজুরেরা মার্কসবাদ-লেনিনবাদের মূল শিক্ষাগুলোকে আয়ত্ত করতে না পারেন তাহলে বিপ্লব সফল হওয়া সম্ভব নয়। তিনি বারবার বলতেন যে, এদেশের কম্যুনিস্ট নামধারী পার্টিগুলো এই অত্যন্ত জরুরি অথচ কষ্টসাধ্য সংগ্রামটি অবহেলা করার ফলেই ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের অশেষ ক্ষতি সাধিত হয়েছে। আমি জানি, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে আজ যে অসংখ্য কর্মী কমরেড ঘোষের শিক্ষায় উদ্দীপ্ত হয়ে সমস্ত বাধা বিঘ্ন ও প্রতিকূলতাকে উপেক্ষা করে দলের নানা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন, তাদের মধ্যে এই আকুতিই সর্বক্ষণ কাজ করে যে, কীভাবে তাঁরা কমরেড ঘোষের শিক্ষাগুলোকে অনুশীলন করতে পারেন এবং কীভাবে ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সাথে নিজেদের বিলীন করতে পারেন। তাঁরা এ ব্যাপারে সচেতন যে, জীবনে উন্নত সর্বহারা রুচি-সংস্কৃতির মান অর্জন করতে না পারলে শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সাথে ব্যক্তিস্বার্থকে বিলীন করা সম্ভব নয়।

আজ প্রতিক্রিয়াশীল, ক্ষয়িষ্ণু ও জরাগ্রস্ত বিশ্বপুঁজিবাদের যুগে, বিশেষ করে সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী-

সাতের পাতায় দেখুন

গুরগাঁও ঃ পুঁজির নগ্ন শোষণের বিরুদ্ধে শ্রমিক বিস্ফোরণ

গত ২৫ জুলাই বঞ্চিত লাঞ্ছিত শ্রমিকের রক্তে লাল হয়ে উঠেছিল হরিয়ানার গুরগাঁও। পুলিশের লাঠিতে রক্তাক্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েও রেহাই মেলেনি শ্রমিকদের। চতুর্দিক ঘিরে রেখে সেদিন এমন নৃশংস অত্যাচার সংঘটিত হয়েছিল, যাকে অনেকে একমাত্র পরাধীন ভারতে ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচারের সমতুল বলে বর্ণনা করেছেন। জাপানি বহুজাতিক হন্ডা কোম্পানির শ্রমিকদের উপর হরিয়ানার কংগ্রেস সরকারের পুলিশের এই বর্বরতার নিন্দা করেছেন সবাই, ধিক্কার জানিয়েছে সারা দেশ।

বিশ্বায়ন ও উদারীকরণের নীতি পুঁজির কী বর্বর অত্যাচার কায়েম করেছে গুরগাঁওয়ের নৃশংস ঘটনা আবারও তা প্রমাণ করল। বিশ্বায়নের যুগে পুঁজির 'মানবিক মুখ', শ্রমিকের ও সমাজের প্রতি দায়িত্বশীল 'নতুন ধরনের পুঁজিবাদ' ইত্যাদি মনভোলানো মিথ্যার মুখোস খুলে দিয়েছে গুরগাঁও। বিশ্বায়নের প্রবক্তারা বলেছিলেন — ঊনবিংশ শতকে পুঁজির যে বর্বর শোষণ দেখে মার্কস 'ক্যাপিটাল' লিখেছিলেন, এঙ্গেলস লিখেছিলেন 'কন্ডিশন অব ওয়ার্কিং ক্লাস ইন ইংল্যান্ড', পুঁজিবাদের যে বন্য চেহারা দেখে তাঁরা শ্রেণীসংগ্রামের তত্ত্বের জন্ম দিয়েছিলেন, একবিংশ শতকে পুঁজিবাদ আর সেই পুঁজিবাদ নেই। তা এখন মানবিক, সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি ও শিল্পায়নের প্রতি দায়বদ্ধ। গুরগাঁওয়ের শ্রমিকদের ন্যায্য দাবির প্রতি হন্ডা কোম্পানির মালিকদের আক্রমণাত্মক বিদ্বেষ, মালিকশ্রেণীর পোষা সরকার ও পুলিশের অমানবিক আচরণ আবারও দেখিয়ে দিয়েছে — বাইরের বচন ছাড়া পুঁজির চরিত্র বদলায়নি এতটুকু। বরং একুশ শতকে পোষা সরকার, পুলিশ প্রশাসন এবং পোষা শ্রমিক নেতাদের জোরে পুঁজিবাদ আরও নিষ্ঠুর, আরও হৃদয়হীন। উনিশ শতকে আমেরিকার শিকাগো শহরে কসাইখানার শ্রমিকদের উপর বর্বর মালিকী শোষণের নৃশংসতা চিত্রিত করেছিলেন আপটন সিনক্লেয়ার তার 'জাঙ্গল' উপন্যাসে। বইটি ছিল শহীদ ভগৎ সিংয়ের প্রিয় গ্রন্থ। মার্কিন পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে সিনক্লেয়ার বলেছিলেন — জঙ্গল। পুঁজিবাদের সৌভাগ্য গুরগাঁওতে একজন আপটন সিনক্লেয়ার নেই। নেই একজন রামকুমার বিদ্যারত্ন, যিনি চা-বাগানের কুলিদের উপর পুঁজির নিষ্ঠুর শোষণের বিরুদ্ধে সমাজবিবেককে জাগাতে

চারের পাতায় দেখুন

২৬ জুলাই হরিয়ানায় এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ মিছিল। গুরগাঁওয়ে বর্বরোচিত পুলিশি আক্রমণের প্রতিবাদে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি ২৮ জুলাই গুরগাঁও বন্‌ধ পালন করে। এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী ঐদিন ১২ ঘন্টা হরিয়ানা বন্‌ধের ডাক দেয়। পুলিশ ৫০ জন এস ইউ সি আই কর্মীকে গ্রেপ্তার করে। বন্‌ধ সর্বাত্মক সফল হয়।

নিন্দায় এস ইউ সি আই

হরিয়ানার গুরগাঁওয়ে অবস্থিত হন্ডা মোটর সাইকেল এ্যান্ড স্কুটার কোম্পানি অধিকতর লাভ করায় সেখানকার শ্রমিকরা তাদের ছাঁটাই হওয়া সহকর্মীদের পুনর্বহাল ও মজুরি বৃদ্ধির অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত দাবিতে যে আন্দোলন করছিল তার উপর ২৫ জুলাই হরিয়ানার কংগ্রেস সরকারের পুলিশ যেভাবে নৃশংস লাঠিচার্জ করেছে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৬ জুলাই এক বিবৃতিতে তার তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, পুলিশের এই পাশবিক বর্বরতা কংগ্রেস পরিচালিত হরিয়ানা সরকার ও কংগ্রেস পরিচালিত সিপিএম সমর্থিত কেন্দ্রের ইউ পি এ সরকার — উভয়েরই জনবিরোধী শ্রমিকশ্রেণীবিরোধী ফ্যাসিস্ট চরিত্রকেই নগ্ন করে দিয়েছে। এই ঘটনা আবার দেখিয়ে দিল, কেন্দ্রে বা রাজ্যে কংগ্রেস বিজেপি ও সিপিএম যে দলই যেখানে ক্ষমতায় থাকুক না কেন, দেশি-বিদেশি বৃহৎ পুঁজির স্বার্থরক্ষায় শ্রমিক আন্দোলনকে নৃশংসভাবে দমন করার ক্ষেত্রে এরা কেউ কারোর থেকে পিছিয়ে নেই।

কমরেড মুখার্জী ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষী পুলিশদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, আহত শ্রমিকদের সরকারি ব্যয়ে চিকিৎসা ও উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল সহ শ্রমিকদের সকল ন্যায্য দাবি মেনে নেওয়ার জন্য এবং নিখোঁজ শ্রমিকদের অবিলম্বে সন্ধান করার জন্য দাবি করেছেন।

মুর্শিদাবাদ

জলঙ্গিতে ভাঙন দুর্গতদের বিক্ষোভ

''আমাদের বাড়ি, জমি ছিল, তার দলিল আছে, আমরা ট্যাক্স দিই। সরকার নদীর পাড় বাঁধিয়ে দিলে জীবজন্তুর মত আমাদের আজ বসবাস করতে হত না। আমাদের দুরবস্থার জন্য সরকারই দায়ী।'' ১৯ জুলাই জলঙ্গি বিডিও অফিসের সামনে ক্ষোভের সাথে কথাগুলি বলেন নদীভাঙনে সর্বস্বহারানো জামিরুন বিবি। এদিন বিডিও অফিসে বন্যাভাঙন প্রতিরোধ কমিটির বিক্ষোভের কর্মসূচি ছিল। ১৬ জুলাই মুখ্যমন্ত্রীর মুর্শিদাবাদ সফর ভাঙন দুর্গত মানুষদের কোন আশার আলো দেখাতে পারেনি। ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি যুদ্ধকালীন গুরুত্ব দিয়ে পুনর্বাসন, শুখা মরশুমে নদীর পাড় বাঁধানো, সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়ণের মধ্য দিয়ে বাস্তুহারাদের খাবারের ব্যবস্থা করা এবং ভাঙন সমস্যাকে জাতীয় বিপর্যয় হিসাবে ঘোষণার দাবি জানালেও মুখ্যমন্ত্রী এ বিষয়ে তৎপরতাহীন। তাই পাঁচ শতাধিক মানুষের বিক্ষোভ ১৯ জুলাই বিডিও অফিসে আছড়ে পড়ে। জয়েন্ট বিডিও পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে যান। অত:পর বিক্ষোভকারীরা রাস্তা অবরোধ করে। যথারীতি রাজ্য সরকারের পুলিশ ও সিপিএমের ঠ্যাঙাড়ে বাহিনী লাঠি হাতে অবরোধ ভাঙতে নামে। এইভাবে সিপিএম-সরকার দুর্গত মানুষদের প্রতি তাদের দায়িত্ব পালন করে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রের কংগ্রেস পরিচালিত ইউ পি এ সরকারের ভূমিকা কী? মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী নদীর পাড় বাঁধানোর জন্য ৬৮ কোটি টাকা ঘোষণা করেছেন। শুখা মরশুম পার হয়ে গেল। স্তূপীকৃত বোল্ডার জলঙ্গির রাস্তার ধারে পড়ে রইল ; নদীর পাড় বাঁধানোর কাজ শুরুই হল না। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের নির্মম উদাসীনতা ও অবহেলায় দুর্গত মানুষের সমস্যা বেড়েই চলেছে। মুর্শিদাবাদের মানুষ ভাঙনপ্রতিরোধ সংগ্রামের শহীদ সেখ নহিরুদ্দিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১৭ই জুলাই প্রতি বছরের মত এবারও সংগ্রামের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছে।

ছাত্রআন্দোলনে পুলিশের লাঠিচার্জ

গুরগাঁও-এ শ্রমিকদের উপর নির্মম পুলিশী লাঠিচার্জের নিন্দায় যখন সারা দেশে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ধিক্কার ধ্বনিত হচ্ছে, ঠিক সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য 'পশ্চিমবঙ্গে গুরগাঁওয়ের মত পরিস্থিতি হবে না' বললেও তাঁর পুলিশবাহিনী ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে লাঠিচার্জ করে চলেছে। গত ২৮ জুলাই কলকাতায় শূন্য পদ পূরণের দাবিতে নার্সদের আন্দোলনেই শুধু লাঠিচার্জ করেনি ২৬ জুলাই চরলবণগোলা হাইমাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীদের আন্দোলনেও লাঠিচার্জ করেছে পুলিশ। মূল রাস্তা থেকে স্কুলে যাওয়ার তিন শ' মিটার রাস্তা সংস্কারের দাবিতে মাদ্রাসার ছাত্রছাত্রীরা স্থানীয় পঞ্চায়েতের কাছে ডেপুটেশন দিতে গিয়েছিল। পঞ্চায়েত ডেপুটেশন নিতে অস্বীকার করায় ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে। পঞ্চায়েতের ডাকে ভগবানপুর থানার পুলিশবাহিনী দ্রুত ছুটে আসে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপর লাঠিচার্জ করে ও কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে। এই অবস্থায় ছাত্ররা রাস্তা অবরোধ করে। আন্দোলনের চাপে পুলিশ পঞ্চায়েত ও আন্দোলনকারী ছাত্রদের নিয়ে আলোচনায় বসতে বাধ্য হয়। পঞ্চায়েত ৭ দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু করার প্রতিশ্রুতি দেয়। ছাত্র সংগ্রাম কমিটির নেতৃত্বে এই আন্দোলনে স্কুলের পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে।

উত্তর ২৪ পরগণা

জেলাশাসকের দপ্তরে শ্রমিক অভিযান

ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উদ্যোগে ১৫ জুলাই বারাসতে জেলাশাসকের দপ্তর অভিযান করা হয়। চটকল শ্রমিক, বিড়ি শ্রমিক, রিক্সাভ্যান শ্রমিক সহ বিভিন্ন অংশের শ্রমিক কর্মচারীরা তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে ভয়াবহ সঙ্কটের প্রতিকারের দাবি নিয়ে মিছিল সহকারে এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বক্তব্য রাখেন ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর উত্তর ২৪ পরগণা জেলা সম্পাদক কমরেড অমল সেন। তিনি বলেন, ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে ৮টি চটকল সহ অসংখ্য কলকারখানা বন্ধ হয়ে আছে — হাজার হাজার শ্রমিক কর্মহীন। মালিকরা 'উৎপাদনভিত্তিক বেতন' চালু সহ নানা শর্ত চাপিয়ে লক-আউট করে রেখেছে। প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং গ্র্যাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করছে। সরকার এবং প্রশাসন নীরব থেকে মালিকদের এই বেপরোয়া লুঠকেই সমর্থন করছে। বিড়ি শ্রমিকদের পি-এফ চালু হয়নি, ভ্যান শ্রমিকদের যাত্রী পরিবহন নিষিদ্ধ করে হাবড়া এবং অশোকনগর মিউনিসিপ্যালিটি ফতোয়া জারি করেছে। জেলাশাসকের পক্ষে বারাসতের মহকুমাশাসক শ্রমিক প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেডস্ অমল সেন, চিত্ত ভট্টাচার্য, ননীবালা বিশ্বাস, করুণকুমার দত্ত, বদরুদ্দিন ও পতিত পাবন মণ্ডল। শ্রমিক সমাবেশে বিড়ি শ্রমিক নেতা কমরেড অশোক দাস বক্তব্য রাখেন।

নদীয়া

করিমপুরে কে কে এম এস সম্মেলন

৯ জুলাই প্রকাশ্য সমাবেশের মধ্য দিয়ে করিমপুর ২নং ব্লক সম্মেলন শুরু হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন কৃষক ও খেতমজুর সংগঠনের নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড জাকিমউদ্দিন। প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও কয়েকশ' মানুষ গভীর মনোযোগ সহকারে বক্তব্য শোনেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট শিক্ষক কমরেড আলতাফ হোসেন। ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দেড় শতাধিক কৃষক ও খেতমজুর প্রতিনিধি সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। প্রতিনিধি সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন কমরেড শেরফুল আনসারি। মূল প্রস্তাব উত্থাপন করেন কমরেড আব্বাস আলি। বহু প্রতিনিধি প্রস্তাবের উপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করে প্রতিনিধি সম্মেলনকে প্রাণবন্ত করে তোলেন। কমরেড জামসেদ আলিকে সভাপতি এবং কমরেড আলতাফ হোসেনকে সম্পাদক করে ২১ জনের ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

১০ জুলাই কৃষক ও খেতমজুরদের রাজনৈতিক ক্লাস পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড স্বপন ঘোষাল।

কে পি এস গিলের কারাদণ্ডের দাবিতে বিক্ষোভ

রুপন বাজাজ নামের এক সরকারি অফিসারের সাথে অশালীন আচরণ করেন পাঞ্জাব পুলিশের প্রাক্তন প্রধান কে পি এস গিল। এই অপরাধের জন্য শুধু কিছু অর্থ জরিমানা নয়, তাঁর কারাদণ্ড দাবি করে ১ আগস্ট কলকাতার ধর্মতলায় এম এস এস-এর বিক্ষোভ।

সীমান্তে গেটের দাবিতে পথ অবরোধ

সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ায় যাদের জমি বেড়ার ওপারে রয়েছে চাষে তাদের মারাত্মক সমস্যা হচ্ছে। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে নিজের জমিতে চাষ করতে না পেরে হৃদরোগে মারা যান কোচবিহারের মাথাভাঙা মহকুমার কৃষক ভদ্রকান্ত রায়। ঐ সীমান্তে বুড়াবুড়ি গ্রামের ১৫০টি পরিবারের প্রায় নয়শ বিঘা জমি কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে। এই মরশুমে কেউ তাদের নিজের জমিতে চাষ করতে যেতে পারছে না। কারণ দুই-আড়াই কিমির মধ্যে কোন গেট নেই। নিরুপায় কৃষকরা বি এস এফ ক্যাম্পে আবেদন জানালেও কোন ফল হয়নি। বিডিও ও জেলাশাসককে জানানোর পরও সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। এমতাবস্থায় এলাকায় কৃষকরা সংগঠিত হয়ে গড়ে তোলেন 'সীমান্ত নাগরিক অধিকার রক্ষা কমিটি'। চাষের জন্য দিনে ১২ ঘণ্টা গেট খোলা রাখার দাবিতে ১১ জুলাই কৃষকরা মাঝেরবাড়িতে মাথাভাঙা-শিলিগুড়ি সড়ক অবরোধ করে। অবরোধ চলে প্রায় আড়াই ঘণ্টা। অবরোধ স্থলে ছুটে এসে আলোচনায় বসেন মাথাভাঙার পুলিশ অফিসার, বিডিও ও বিএসএফের এক কমান্ডো। কৃষকদের সম্মিলিত আন্দোলনের চাপে তাঁরা দাবি মানতে বাধ্য হন। অবরোধ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন — অতুল রায়ডাকুয়া, জগদীশ অধিকারী, সুশীল রায় প্রমুখ।

নদীয়ায় বিদ্যুৎ আন্দোলনের ব্যাপক প্রস্তুতি

গত ২৪ জুলাই বশরখোলা হাইস্কুলে দুই শতাধিক বিদ্যুৎগ্রাহকের উপস্থিতিতে সারা বাংলা বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির হাটগাছা আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য ওয়াজেদ মল্লিক, বক্তব্য রাখেন সংগঠনের থানা সম্পাদক সন্দীপ সাহা, কোষাধ্যক্ষ মহিউদ্দিন মণ্ডল, বিশিষ্ট শিক্ষক স্বপন কুণ্ডু ও জেলা কমিটির কোষাধ্যক্ষ হররোজ আলী সেখ। ওয়াজেদ মল্লিককে সভাপতি, স্বপন কুণ্ডুকে সহসভাপতি ও জামালউদ্দীন সেখ এবং ইনামুর রহমানকে যুগ্ম সম্পাদক করে সারা বাংলা বিদ্যুৎ গ্রাহক সমিতির হাটগাছা আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়।

ঐ দিন বিকালে শতাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের উপস্থিতিতে নসীপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ-গ্রাহক সমিতির গোবড়া আঞ্চলিক কমিটি গঠন করা হয়। ঐ কমিটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ রাধাগোবিন্দ সেন।

এছাড়াও কালীগঞ্জ পালিত বেথিয়ায় আঞ্চলিক কমিটি গঠিত হয়েছে। মীরা-১নং, মীরা-২নং, বড়চাঁদঘর, পলাশী-১নং ও পলাশী-২নং অঞ্চলে যৌথভাবে ২৫ জুলাই কমিটি গঠিত হয়। পলাশী মীরা বালিকা বিদ্যানিকেতনের সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা সম্পাদক তপন ঘোষ।

২৫ জুলাই দেবগ্রাম স্টেশন সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসে এবং ২৬ জুলাই কালীগঞ্জ ও পলাশী কলসেন্টারে বিল বয়কট হয়। এই বিল বয়কটে এলাকার বিদ্যুৎগ্রাহকগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন, বিল বয়কট সম্পূর্ণভাবে সফল হয়।

গণদাবী'র গত (৫৮ বর্ষ ১ম) সংখ্যায় ১৯ জুলাই নদীয়া জেলার পথ অবরোধ সংক্রান্ত রিপোর্টে ভুলবশত বলা হয়েছিল দেবগ্রাম সুপারিনটেন্ডেন্ট অফিসে বিক্ষোভ সমাবেশে অন্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন কালীগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ, বাস্তবে তিনি বক্তব্য রাখেন নি। ঐ বিক্ষোভ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন বিদ্যুৎগ্রাহক সমিতির কালীগঞ্জ থানা কমিটির সম্পাদক সন্দীপ সাহা, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি ওয়াজেদ মল্লিক, মহিউদ্দীন মণ্ডল ও অন্যান্যরা।

তমলুক থেকে জেলা অফিস সরানোর প্রতিবাদে

তমলুক শহর থেকে ৬ কিমি দূরে নিমতৌড়িতে জেলা আদালত ও জেলাস্তরের অফিসগুলি সরানোর প্রতিবাদে এবং তমলুক মহকুমার ৮২৬টি মৌজাকে যুক্ত করে হলদিয়া-তমলুক উন্নয়ন পর্ষদ গড়ে এই এলাকার মানুষের উপর বিপুল কর চাপানোর চক্রান্তের প্রতিবাদে এবং তমলুক শহর উন্নয়নের ১০ দফা দাবিতে ১৫ জুলাই বেলা ১২টা থেকে ৫টা পর্যন্ত তমলুক হাসপাতাল মোড়ে এস ইউ সি আই-এর আহ্বানে শত শত মানুষ গণঅবস্থান করে বিক্ষোভ দেখায়। অবস্থান মঞ্চ থেকে কমরেডস্ মানিক মাইতি, লেখা রায়, প্রদীপ দাস ও প্রণব মাইতি জেলাশাসকের কাছে ডেপুটেশন দেন।

কমরেড মানিক মাইতি বলেন, তমলুক শহরকে মরুভূমি করার এই সিদ্ধান্ত বাতিল না করলে এবং তমলুক উন্নয়নের দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর না করলে আরও তীব্র গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে। ১০ দফা দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করা হচ্ছে, জনমত সংগঠিত করে এই দাবিগুলি নিয়ে জঙ্গি গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

গণঅবস্থানে বক্তব্য রাখেন দলের জেলা সম্পাদক কমরেড মানব বেরা এবং কমরেডস্ অশোকতরু প্রধান, বাসুদেব দাস ও অনিতা মাইতি।

প্রসঙ্গ ঃ কুলতলি

কল অধর্মের

এস ইউ সি আই বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইতের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ঘটনায় এই মুহূর্তে রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। 'ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর' যে বাংলা দৈনিকটিতে এস ইউ সি'র আন্দোলনের খবর ক্বচিৎ মেলে, সেই কাগজটি ২১ জুলাই পাতার পর পাতা ব্যয় করেছে প্রবোধবাবুর শাস্তি প্রসঙ্গে। ২২ জুলাই তারা 'ধর্মের কল' শীর্ষক সম্পাদকীয় লিখে স্বাগত জানিয়েছে আদালতের রায়কে। তবে ওই সম্পাদকীয় কলামেই, সম্ভবত একপেশেমিকে আড়াল করার ইচ্ছেতেই সম্পাদক মশায়কে লিখতে হয়েছে — ''রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ফাঁসাইতে অনেক সময় মিথ্যা মামলার আশ্রয় লওয়া হয়।'' এ রাজ্যে গণআন্দোলনই এখন শাসক সিপিএমের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। আর যেহেতু গণআন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসেবে এস ইউ সি'র গ্রহণযোগ্যতা এখন প্রশ্নাতীত, তাই এস ইউ সি'ই এখন সিপিএমের মূল প্রতিপক্ষ। ফলে এস ইউ সি'কে নিকেশ করার যাবতীয় পন্থাপদ্ধতিই সিপিএমের পক্ষে গ্রহণীয়। গণআন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর ভূরিভূরি দৃষ্টান্ত সেই ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে কংগ্রেস আমল হয়ে হাল আমলের বামফ্রন্ট শাসনেও স্থাপিত হয়ে চলেছে। এই তো এবছর ৩১ মার্চ মুর্শিদাবাদ জেলা জজ কোর্ট 'বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটি'র ৬৩ জন অভিযুক্তকেই বেকসুর খালাস করে দিলেন। ২০০০ সালের ২৪ আগস্ট জেলার বর্ষীয়ান বিশিষ্ট নাগরিক ও বুদ্ধিজীবী সহ সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ আইন অমান্য আন্দোলনে সামিল হলে পুলিশ তাদের উপর নির্মম বর্বরোচিত আক্রমণ করেই ক্ষান্ত হয়নি, খুনের চেষ্টা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, হামলা প্রভৃতি জামিন-অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করে। এর আগে ১৯৯২ সালের ২ নভেম্বর হরিহরপাড়ায় সমাজ-বিরোধী দৌরাত্ম্যের প্রতিবাদে আন্দোলনরত শান্তিপূর্ণ নিরস্ত্র জনতার উপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে সাতজনকে শুধু হত্যাই করেনি, একইভাবে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলাও সাজিয়েছিল পুলিশ এবং সিপিএম। সরকার নিযুক্ত তদন্ত কমিশনে পুলিশের অপরাধ প্রমাণিত হয়েছে তবু পুলিশকে শাস্তি পেতে হয়নি, এমনকী কমিশনের তরফে নিহতদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার যে সুপারিশ করা হয়েছিল তা-ও কার্যকরী করেনি রাজ্য সরকার। গণআন্দোলন সম্পর্কে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকারের সামগ্রিক এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে না পারলে প্রবোধ পুরকাইত সহ এস ইউ সি' নেতা-কর্মীদের দণ্ডাদেশের সঠিক ব্যাখ্যা মিলবে না।

প্রবোধবাবুর দণ্ডাদেশ ঘোষিত হওয়ার আড়াই মাস আগে ৩০ এপ্রিল আরও ১১ জন এস ইউ সি' নেতা-কর্মীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে নিম্ন আদালত। মিথ্যা মামলায় দণ্ডিত ওই নেতা কর্মীদের কারামুক্ত করার মানসে ওই দল উচ্চ আদালতে মামলা লড়ার মনস্থ করেছে। মামলা লড়ার খরচ-খরচার জন্য দলীয় মুখপত্র 'গণদাবী'তে জনগণের প্রতি সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে। ওই আবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, সিপিএম-ঘাতকবাহিনীর আক্রমণে শুধুমাত্র দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাতেই এস ইউ সি'র ১৪১ জন নেতা-কর্মী নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন ওই দলের রাজ্য কমিটির প্রবীণ সদস্য তথা ঐতিহাসিক তেভাগা আন্দোলনের নেতা আমির আলি হালদার; আছেন কৃষক নেতা মোকারম খাঁ, ছাত্র-যুবকদের নেতা অশোক হালদার। জনতার আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে নেতৃত্বে বৃত হওয়া এইসব মানুষের জন্য এলাকার ঘরে ঘরে ছিল শ্রদ্ধার আসন পাতা। তাই কোনওভাবেই যখন কায়দা করা যাচ্ছিল না তখনই শুরু হলো শাসকদের সেই সুপরিচিত খেলা। খুন করা এবং খুনের মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার ছক। এলাকায় কোনও ডাকাতির ঘটনা ঘটলে তাতেও এস ইউ সি'র নেতৃস্থানীয় কর্মী-সংগঠকদের নাম জুড়ে দিয়ে গ্রেপ্তার করতেও বামফ্রন্টের বশংবদ পুলিশের বিবেকে বাধছে না আর। প্রকাশ্য রাজপথে প্রতিবাদী এস ইউ সি মহিলা কর্মীদের শ্লীলতাহানি করতে দ্বিধা করে না যে পুলিশ, মার্কামারা সমাজবিরোধীদের সাথে খানা-পিনা করতেও লজ্জা পায় না যে পুলিশ, সেই পুলিশের পক্ষেই তো সম্ভব এস ইউ সি'র নেতা-কর্মীদের মিথ্যা কেসে ফাঁসানো। ৩০ এপ্রিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার যে ১১ জন এস ইউ সি নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে নিম্ন আদালত যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছে তাদের মধ্যে রয়েছে ওই দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর তিন জন সদস্য। বাকি আট জনও মধ্যবিত্ত এবং ক্ষেতমজুর ঘর থেকে আসা পার্টির বিশিষ্ট কর্মী ও সংগঠক। এর আগেও ওই জেলারই আরও ৫ জন এবং বর্ধমান জেলার দু'জন জেলা কমিটির সদস্য সহ ৬ জনকে একইভাবে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে। এর বাইরেও বিভিন্ন জেলায় আরও ৫৩ জন নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মার্ডার কেস সাজানো হয়েছে। অতএব চক্রান্তের গভীরতা কি কারোর না বোঝার কথা? উপযুক্ত ক্ষেত্রসমীক্ষার দ্বারা উপরোক্ত ঘটনাগুলির উপর আলোকপাত করতে যে সংবাদপত্রকে কখনও দেখা যায় না, সেই সংবাদপত্রই আজ প্রবোধ পুরকাইতের শাস্তির সূত্র ধরে মূল্যবান সম্পাদকীয় স্তম্ভ খরচ করেছে। পুনরুজ্জীবিত করেছে ২০ বছর আগের গল্প, ছেলের রক্তমাখানো ভাত মাকে খাওয়ানোর গল্প, কাটা মুণ্ডু নিয়ে ফুটবল খেলার গল্প, ধর্ষণের গল্প ইত্যাদি। প্রবোধবাবু কুলতলি কেন্দ্রের ৯ বারের বিধায়ক, বিধানসভায় একমাত্র বিরোধী কণ্ঠের অন্যতম প্রতিনিধি এবং সুন্দরবন এলাকায় সিপিএমের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের (পরমাণু চুল্লী স্থাপন, সাহারার বিনোদন পার্ক, হুকাহারানিয়া নদীর মৃত্যু ঘটানো ইত্যাদির) বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। সুতরাং 'উন্নয়ন'-এর ধ্বজাধারী কংগ্রেস-সিপিএম এবং সংবাদপত্র এই মওকা ছাড়বে কেন! এদের ত্রাহস্পর্শে এস ইউ সি' তথা গণআন্দোলনের কিছু পরিমাণ ক্ষতি যে হবে, তা বলাই বাহুল্য। তবে রক্তমাখা ভাতের গল্প কেউ বিশ্বাস করবে বলে মনে হয় না। যে সমস্ত নিষ্ঠাবান, নিবেদিত প্রাণ, সংস্কৃতিমান এস ইউ সি' কর্মীদের আমাদের চারপাশে দেখা যায়, তার ভিত্তিতে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ছেলের রক্তমাখা ভাত মাকে খাওয়ানোর মত জঘন্যতা তাদের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব নয়।

বস্তুত এস ইউ সি'র কল্যাণেই এদেশের মানুষ আজও বিস্মৃত হতে পারেন নি ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং, মাস্টারদা প্রমুখ অগণ্য বীর বিপ্লবীদের আত্মত্যাগ। ভুলতে ভুলতেও ভুলতে পারেননি যৌবনের অগ্রদূত কবি কাজী নজরুল ইসলামকে। স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন ধারার প্রধান সাহিত্য-প্রতিনিধি শরৎচন্দ্রের নতুন মূল্যায়ন ওই দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের অক্ষয় কীর্তি। তাঁর শিক্ষায় শিক্ষিত দলের কর্মীরা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েও প্রতি বছর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ক্ষুদিরাম, ভগৎ সিং-এর শহীদ দিবস পালন করেন। বোঝাই যায়, এরা অন্য জিনিস। অগ্নিযুগের কিংবদন্তী বিপ্লবী বিমল দাশগুপ্ত প্রয়াত হওয়ার আগে বলেছিলেন, এস ইউ সি'র কর্মীদের দেখে আমাদের সেই ফেলে আসা সময়ের কথা মনে পড়ে। প্রবীণ বিপ্লবীর 'ফেলে আসা সেই সময়টা' আমরা প্রত্যক্ষ করিনি, কিন্তু এদের রুচি, সংস্কৃতি, লড়াইয়ের তেজ যা প্রতিনিয়ত প্রত্যক্ষ করছি তাতে অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এদের প্রভেদ খুব স্পষ্ট। আন্দোলনের ময়দানে এদের নারী-কর্মীদের দেখে সহজেই মনে পড়ে যায় নজরুলের কবিতার লাইন — ''শাড়ি মোড়া যেন আনন্দ-শ্রী / দেখো বাংলার নারী / দেখনি এখনো, ওঁরাই হবেন / অসি-লতা তরবারি।'' এদের কর্মীদের সাথে বামফ্রন্টের পুলিশকে এমন নিকৃষ্ট আচরণ করতে হয়, যা করতে পারেনি ব্রিটিশ পুলিশও সে যুগের বিপ্লবীদের সাথে। ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলনরত এস ইউ সি কর্মীকে রক্তাক্ত করার পর পুলিশ তাদেরকে হাসপাতালের বেডের সাথে বেঁধে রাখে! শোষকের প্রতিনিধি শাসকেরা সব যুগেই বিপ্লবীদের প্রতি যেমন নির্মম-নিষ্ঠুর হয়, তেমনি নির্মমতা-নিষ্ঠুরতাই প্রদর্শিত হচ্ছে এস ইউ সি'র প্রতি। ফলে মিথ্যা কেসে ফাঁসানোর মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নাই।

এস ইউ সি পরিচালিত আন্দোলনে বর্বর পুলিশী অত্যাচার নামিয়ে এনেও যখন তাদের মনোবল ভেঙে দেওয়া গেল না, যখন বিধানসভা নির্বাচনে (দক্ষিণ ২৪ পরগণা) আসন সমঝোতার প্রস্তাব দিয়েও কায়দা করা গেল না, তখন এস ইউ সি'কে শিক্ষা দিতে এই রাস্তা ধরল সিপিএম। পুরানো সব কেস, যা বেনাম জমি উদ্ধার ও অন্যান্য কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল, খুঁচিয়ে তোলা হলো। যোগাড় করা হলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সাক্ষীসাবুদ। এই করে ওই দলের গুরুত্বপূর্ণ নেতা-সংগঠকদের জেলে পোরার একটা হিড়িক শুরু হয়েছে। প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন পরিচালনায় অগ্রণী এস ইউ সি'র জেলা নেতা তথা প্রবীণ প্রধান শিক্ষক রাজারাম রায়মণ্ডল সহ ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশটি যে আদালতে ৩০ এপ্রিল সম্পন্ন হয়েছে সেখানে পাঁচ বছরে ৪ বার বিচারপতি পরিবর্তন করা হয়েছে। এতেই বোঝা যায় সরকারের উদ্দেশ্যটি কী। প্রবোধবাবুর ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য পরিষ্কার। নিম্ন আদালত তাঁকে অব্যাহতি দিলেও রাজ্য সরকার উচ্চ আদালতে আপীল করে, অথচ এই সরকারই জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চ আদালতে যেতে চায় না। বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন পারস্পরিক ভর্তুকি তুলে দেওয়ার সুপারিশ করলে এস ইউ সি প্রভাবিত গণসংগঠন সুপ্রীম কোর্টের দ্বারস্থ হয়, অন্যদিকে নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকে সিপিএম পরিচালিত রাজ্য সরকার।

শুধুমাত্র বিদ্যুতের ক্ষেত্রেই নয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মূল্যবৃদ্ধি সহ প্রতিটি ক্ষেত্রেই এস ইউ সি আন্দোলন গড়ে তোলায় যথেষ্ট আন্তরিক। এ জেলার (মুর্শিদাবাদের) বৈষ্ণবডাঙ্গায় বিড়ি শ্রমিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে পুলিশের গুলিতে তাদের কর্মীর আত্মদান, ভাঙন প্রতিরোধ আন্দোলনে আখেরিগঞ্জে নহীরুদ্দিনের শহীদ হওয়া ইত্যাদির মধ্য দিয়ে গণআন্দোলনে বিকল্প শক্তি হিসেবে এস ইউ সি'র আত্মপ্রকাশ স্বভাবতই স্থিতাবস্থার রক্ষক-দের ভাবিয়ে তুলেছে। তারা মরিয়া হয়ে উঠেছে এস ইউ সি'কে ফিনিস করার জন্য। বিচার ব্যবস্থার অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে প্রবোধবাবুর মত নেতাদের কারান্তরালে পাঠাবার চক্রান্ত তারই অঙ্গ।

প্রবোধবাবুর শাস্তি প্রসঙ্গে সিপিএম-কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াও খুব তাৎপর্যপূর্ণ। 'প্রধান বিরোধী' তৃণমূল নেত্রী তো কোনও মন্তব্যই করতে চাননি। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস বলেছেন, ''আমরা আদালতের রায়ের ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করি না। এখনও করছি না।'' (আ বা ২১/৭) সত্যিই কি তাই? অনিলবাবুর জুটি বিমান বসু এই তো সেদিন আদালতের রায় সম্পর্কে আলপটকা মন্তব্য করে দণ্ডিত হলেন এবং এক টাকার ভিখিরি সেজে নাটকও করলেন। তাহলে এই গা বাঁচানো প্রতিক্রিয়া কেন? রায়টা তাদের মনোবাসনা পূর্ণ করেছে বলেই কি? সিপিএমের অপর নেতা তথা সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী, যাঁর নেতৃত্বে ওই এলাকায় এস ইউ সি নিধন যজ্ঞ পরিচালিত হচ্ছে, মন্তব্য করেছেন, বিচারের বাণী সব সময় নীরবে কাঁদে না ইত্যাদি। উনি ঠিকই বলেছেন, সব সময় কাঁদে না, কখনও কখনও কাঁদে। বিচারপ্রার্থী এস ইউ সি' হলে তো কথাই নেই। ওই এলাকায় ১৪১ এস ইউ সি' নেতা-কর্মীর ঘাতকেরা কেউ আজও শাস্তি পায়নি। কংগ্রেস নেতা প্রদীপ ভট্টাচার্যও প্রবোধবাবুর শাস্তিতে সন্তোষপ্রকাশ করে বলেছেন, আমাদের দলের দুই কর্মীর হত্যাকাণ্ডের অপরাধীর উপযুক্ত বিচার হয়েছে। অজস্র কালাকানুনের প্রবক্তা কংগ্রেস দলের কোনও নেতার মুখে আইনের শাস্তির বড়াই বিন্দুমাত্র মানায় কি?

(বহরমপুরের 'ঝড়' পত্রিকা থেকে)

কুলতলিতে ছাত্র বিক্ষোভ সমাবেশ

সম্প্রতি কুলতলি থানার ১নং জালাবেড়ে অঞ্চলের কাওরাখালি নকুল-সহদেব স্কুলের নবনির্বাচিত সিপিএম নেতৃত্বাধীন স্কুল পরিচালন সমিতি, স্কুল ফান্ডের ৩ লক্ষাধিক টাকা আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জীব গিরিকে জোর করে ভয় দেখিয়ে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেয় এবং তাদের সমর্থক শিক্ষককে টিচার-ইনচার্জ পদে বসায়। গত ৬ জুলাই এর প্রতিবাদে ছাত্ররা স্কুল ম্যানেজিং কমিটির কাছে ডেপুটেশন দিতে গেলে স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি সিপিএম নেতা বাঙ্কার সরদারের নেতৃত্বে একদল সমাজবিরোধী ছাত্রদের উপর নৃশংস আক্রমণ নামিয়ে আনে।

এই ঘটনার প্রতিবাদে এ আই ডি এস ও'র ডাকে কুলতলি বিধানসভা এলাকার ছাত্র-ছাত্রীরা ৯ জুলাই সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট ও জেলা জুড়ে প্রতিবাদ দিবস পালন করে এবং ১৮ জুলাই প্রায় পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতিতে জামতলায় ছাত্র বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে ঐ স্কুলের দশম শ্রেণীর আহত ছাত্র ঈশ্বর মণ্ডল ও ধরিত্রী হালদার ৬ জুলাইয়ের ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার কথা জানায়। প্রধান বক্তা এ আই ডি এস ও'র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড অঞ্জনাভ চক্রবর্তী বলেন, এইভাবেই সারা রাজ্যে সিপিএম নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজেদের দলীয় লোকেদের দ্বারা ক্ষমতা কুক্ষিগত করে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এ আই ডি এস ও'র জেলা সম্পাদক কমরেড বিশ্বনাথ সরদার। সভাপতিত্ব করেন কমরেড প্রদীপ হালদার।

হন্ডা শ্রমিকদের আন্দোলনের তাৎপর্য বিরাট

একের পাতার পর

চেয়েছিলেন। বিপরীতে হন্ডা কোম্পানি পেয়েছে এমন এক সরকার যারা মালিকশ্রেণীকে দিয়েছে অবাধ ছাঁটাই করার অধিকার, ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চনা করার অধিকার, সমস্ত শ্রম আইনকে লঙঘন করার এবং খুশিমতো ১২, ১৪, ১৬ ঘন্টা অমানুষিক খাটাবার অধিকার। বিশ্বায়ন ইতিহাসের চাকাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যেতে চায় সেই যুগে, যেদিন ৮ ঘন্টার শ্রমদিবস ছিল না, ন্যূনতম মজুরি ছিল না, অন্ধকার ঘুপচি বস্তিতে শ্রমিক বাঁচত শুধু খাটতে খাটতে মরবার জন্য, রেখে যেত সন্তান — যে ভবিষ্যতের মজুর। কিন্তু চাইলেই পুঁজিবাদ চাকা ঘুরিয়ে দিতে পারে না। মার্কসবাদী দর্শন দেখায় প্রকৃতি এবং সমাজের দ্বন্দ্বতত্ত্ব অনুযায়ী পুঁজিই জন্ম দিয়েছে তার বিরুদ্ধ শক্তি শ্রমিকের — যে শ্রমিক পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধশক্তি, পুঁজিবাদবিরোধী শ্রেণীসংগ্রামের পুরোধা। গুরগাঁও দেখালো বিশ্বায়নের মোহময়ী প্রচার, আপসকামী শ্রমিক নেতাদের সমঝোতা কোন কিছুই লড়াইকে চিরদিনের মতো থামাতে পারে না। বাঁচার তাগিদে নিরুপায় শ্রমিক লড়ে, প্রাণ দেয়, তার রক্তস্রোত শোষণমুক্তির আকৃতির প্রবাহ হয়ে মাটি ভিজিয়ে দেয়। এদেশে কংগ্রেস, বিজেপি, বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও সংবাদপত্র এমনকী সিপিএম-সিপিআই যে বলছে — শ্রমিককে বুঝতে হবে আজকের বাস্তব, তাকে দায়িত্বশীল হতে হবে, জঙ্গী আন্দোলন করা চলবে না, পুঁজিবিনিয়োগের অনুকূল পরিবেশ রচনার জন্য মালিকদের বল্গাহীন শোষণ নির্যাতনের আবদার মেনে নিতে হবে — গুরগাঁও দেখাল শ্রমিকশ্রেণী তা মেনে নিতে পারে না।

কী ঘটেছে গুরগাঁওতে? জাপানি বহুজাতিক হন্ডা কোম্পানির কারখানায় প্রায় অর্ধেকই ঠিকা শ্রমিক। ভিন্ রাজ্য থেকে আসা বহু শ্রমিক এখানে কাজ করে। তাদের থাকতে দেওয়া হয় প্রায় আলো-বাতাসহীন ঘরে ঠাসাঠাসি করে। অধিকাংশ শ্রমিককে কাজ করতে হয় কম মজুরিতে। আরও কম মজুরিতে শ্রমিক নিয়োগের মতলবে কোম্পানি যখন খুশি এবং যাদের খুশি ছাঁটাই করে। গত কয়েক বছরে প্রায় হাজার তিনেক শ্রমিককে এইভাবে ছাঁটাই করা হয়েছে। শ্রমিকরা কোন প্রশ্ন তুললেই ছাঁটাই-এর খড়্গ নেমে আসে। শ্রমিকদের সংগঠিত হওয়া বারণ, প্রতিবাদ জানানোটা সেখানে অপরাধ। যাঁরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, তেমন চারজনকে এবার ছাঁটাই করে দেওয়া হয় এবং তাঁদের সহযোগী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্তের নোটিশ জারি করা হয়। শ্রমিকরা সম্মিলিত প্রতিবাদ জানালে সবার বেতন বন্ধ হয়ে যায়। দু'মাস বেতন নেই। শ্রমিকরা তবু মাথা নোয়ায়নি। তারা সরকার ও প্রশাসনের সর্বস্তরে জানিয়েও কোন ফল পায়নি। সরকার ও প্রশাসন নির্বিচারে হন্ডা কোম্পানির স্বেচ্ছাচার চলতে দিয়েছে। শ্রমিকদের ওপর চাপ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কোম্পানি তাদের দু'মাসের বেতন বকেয়া রেখেই এবং কোন আগাম নোটিশ না দিয়েই সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে কারখানা লকআউট ঘোষণা করে দেয়। শ্রমিকরা সরকার ও প্রশাসনকে যথারীতি জানালেও কোন ফল হয়নি। 'আইন ও গণতন্ত্রের রক্ষক' সরকার ও পুলিশ-প্রশাসন এই বেআইনী লকআউটের জন্য কোম্পানির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো নেয়ইনি, বরং তারা কোম্পানি কর্তাদের অনুগত ভৃত্যের মত আচরণ করতে থাকে।

প্রায় একমাস লকআউট। শ্রমিকরা অনাহারে ধুঁকছে, তবু মালিকদের পায়ে মাথা নোয়ায়নি। কারখানা খোলার, ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ, শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার ইত্যাদি দাবিতে তারা আন্দোলন চালিয়ে গেছে। ১৭ জুলাই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী, এ আই টি ইউ সি, সিটু প্রভৃতি কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠন মিলে রোহটকে এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, হন্ডা কোম্পানির সংগ্রামরত শ্রমিকদের সমর্থনে ২৫ জুলাই গুরগাঁওতে সংহতি দিবস পালন করা হবে। সেই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে অন্যান্য কারখানার শ্রমিকরাও ঐদিন সম্মিলিতভাবে গুরগাঁওতে বিক্ষোভ মিছিল ও বিক্ষোভ সমাবেশ করবে এবং ডেপুটি কমিশনারের (ডিসি'র) সঙ্গে দেখা করে দাবিপত্র পেশ করবে। আন্দোলনের এই কর্মসূচি লিখিতভাবে ডিসি-কে আগাম জানিয়েও দেওয়া হয়। পুলিশ হন্ডা কারখানার ১০ কিলোমিটারের মধ্যে সভা করার অনুমতি দিলনা। তখন বাধ্য হয়ে ২৫ জুলাই ১০ কিমি দূরে কমলা নেহেরু পার্কে শ্রমিকরা সমবেত হয় ও সভা করে। এরপর মিছিল করে ডিসি'র কাছে যাওয়ার কথা। কিন্তু ১৪৪ ধারা জারি করে পুলিশ মিছিলের উপরে নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেয়। সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের মালিক তোষণকারী এবং শ্রমিকস্বার্থবিরোধী একের পর এক ক্রিয়াকলাপে এমনিতেই ক্ষুব্ধ ছিল দীর্ঘদিন ধরে অভুক্ত, নির্যাতিত শ্রমিকরা। পুলিশের এই নিষেধাজ্ঞায় তারা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। পুলিশি নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করেই তারা মিছিল বের করে। পরিস্থিতি বুঝে পুলিশ পিছু হটে। কিন্তু মিছিল কল্যাণী হাসপাতালের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশ গতিরোধ করে। ফলে ক্ষিপ্ত শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পুলিশ শেষপর্যন্ত হঠে যায়। ডিসি'র অফিস অভিমুখে মিছিল এগিয়ে চলে এবং সেখানে পৌঁছালে পুলিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় যে, ডি সি নিজে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে স্মারকলিপি নেবেন, তারা যেন অপেক্ষা করে। সেই বিশ্বাসে শ্রমিকরাও স্থানীয় একটি পার্কে শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান করছিল। এমন সময় আচমকা বিশাল পুলিশবাহিনী এসে শ্রমিকদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে এবং নির্মমভাবে লাঠিপেটা করতে থাকে। সেই অত্যাচার যে কী ভয়ঙ্কর তা টিভি'র পর্দায় প্রত্যক্ষ দেখার সুযোগ পেয়ে ভারতবাসী শিউরে উঠেছে। অসংখ্য আহত হয়েছে — অনেকের হাত-পা ভেঙেছে, মাথা ফেটেছে, বুকের পাঁজর ভেঙেছে; বহু শ্রমিক নিখোঁজ, বহু শ্রমিককে পুলিশে পেটাতে পেটাতে তুলে নিয়ে গিয়েছিল থানায় তারপর তাদের খোঁজ নেই। মেরে শেষ করে তাদের দেহ গুম করে দেওয়া হয়েছে কিনা — কেউ জানেনা। কিছু সংখ্যক শ্রমিককে পুলিশ গ্রেপ্তার করে খুনের অভিযোগে জেলে ভরে দিয়েছে। এমনকী ঐদিন পথচারী জনসাধারণকেও কান ধরে বুকে হেঁটে রাস্তা পারপার হতে পুলিশ বাধ্য করেছে। ফলে পুলিশি অত্যাচারের প্রতিবাদে ফুঁসছে গুরগাঁও সহ সমগ্র হরিয়ানা। ২৮ জুলাই গুরগাঁও ধর্মঘট পালিত হয় শ্রমিক সংগঠনগুলির ডাকে। **এস ইউ সি আই এবং ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী সমগ্র হরিয়ানা বন্‌ধের ডাক দিয়েছিল, মানুষের অভূতপূর্ব সাড়ায় তা সর্বাত্মক সফল হয়েছে।**

গুরগাঁওতে বহুজাতিক হন্ডা কোম্পানি যা করেছে, সারা দেশ জুড়ে শ্রমিকদের প্রতি, শ্রমজীবী জনগণের প্রতি সেই একই বঞ্চনা চলছে। শ্রমিকরা ন্যায্য মজুরি দূরে থাক, সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরিও পাচ্ছে না। শ্রমিকদের মাইনে মালিকরা মাসের পর মাস বকেয়া ফেলে রেখে হঠাৎ কারখানা বন্ধ করে উধাও হয়ে যাচ্ছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলি শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড এবং ইএসআই-র কোটি কোটি টাকা লোপাট করে দিচ্ছে। ৮ ঘন্টার বদলে দৈনিক ১০ ঘন্টা - ১২ ঘন্টা করে শ্রমিকদের খাটানো হচ্ছে। ছাঁটাই চলছে ব্যাপকহারে। প্রতিটি রাজ্যেই গড়ে উঠেছে সরকার-প্রশাসন ও স্বেচ্ছাচারি মালিকগোষ্ঠীর প্রত্যক্ষ জোট-বন্ধন। বঞ্চিত ছাঁটাই শ্রমিকরা অর্ধাহারে, অনাহারে বিনা চিকিৎসায় ধুঁকছে, মরছে, আত্মহত্যা করছে। সরকার ও প্রশাসন এইসব শোষণ-বঞ্চনা দেখেও না দেখার ভান করে চুপ করে থাকছে। কিন্তু বঞ্চিত শ্রমিকরা প্রতিবাদে রুখে দাঁড়ালে সরকার ও প্রশাসন নীরব দর্শক থাকছে না, দারুণ সক্রিয় হয়ে পুলিশ ও গুণ্ডাবাহিনী লেলিয়ে দিচ্ছে; শ্রমিকদের মারছে, জেলে পুরছে, এমনকী খুনও করছে। এই পশ্চিমবঙ্গও তার ব্যতিক্রম নয়।

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গুরগাঁও ঘটনা সম্পর্কে বলেছেন, ''পশ্চিমবঙ্গে এ জিনিস হবে না। এ রাজ্যে দাবিদাওয়া নিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন করবে, আর পুলিশ তার উপর ঐভাবে হামলা চালাবে, এ জিনিস বামফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন পশ্চিমবঙ্গে হবে না।'' (গণশক্তি ২৮-৭-০৫) অথচ গত বছরই ২১ আগস্ট মুম্বাইতে 'ডুইং বিজনেস ইন বেঙ্গল' শীর্ষক আলোচনা সভায় শিল্পপতিদের সামনে তিনি বলেছিলেন, ''ট্রেড ইউনিয়নকে এখন উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে হবে, কী করে পণ্যের গুণমান উন্নত করা যায় সেই চেষ্টা করতে হবে। ট্রেড ইউনিয়ন এখনো ষাট সত্তরের ভুল পথে হাঁটতে চাইছে, আন্দোলনের নামে শৃঙ্খলা ভাঙতে চাইছে, এসব চলবে না। ঘেরাও, জঙ্গি আক্রমণ (আন্দোলনকে উনি আক্রমণ বলেছেন) বন্ধ করতে হবে, না হলে আমি পুলিশ পাঠাবো।'' আরও বলেছিলেন, ''ঘেরাও হলে বা অন্য কোন জঙ্গি আচরণ দেখা গেলে পুলিশ পাঠাবো। পাঠিয়েছিও। বাটা কোম্পানিতে পাঠিয়েছি, পেপসি কোম্পানিতে পাঠিয়েছি।'' (আনন্দবাজার, ২৩-৮-২০০৪)

সরকারি বামপন্থী দলগুলির এই আন্দোলনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির কারণেই, গুরগাঁওয়ের লড়াই, শ্রমিকদের সংগ্রামী মনোবল যা দিতে পারত তা পারেনি। দেশিবিদেশি যৌথ মালিকগোষ্ঠী ছাঁটাই শ্রমিকদের পুনর্বহাল মেনে নিয়েছে ঠিক, কিন্তু সাথে সাথে একবছর শ্রমিকরা কোন দাবিদাওয়া তুলতে পারবেনা এই শর্ত মালিকরা শ্রমিকদের দিয়ে মানিয়ে নিয়েছে। সেই সাথে সাসপেন্ড থাকাকালীন বেতন শ্রমিকরা পাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে মালিকদের তদন্ত চলবে — এই শর্তও মালিকরা মানিয়ে নিয়েছে। আন্দোলনকারী যে ৭০ জন শ্রমিককে মিথ্যা অপরাধে অভিযুক্ত করে গ্রেপ্তার করে রাখা হয়েছে তাদেরও মুক্তি দেওয়া হয়নি। তাদের বিরুদ্ধে যথারীতি মামলা চলবে। কাজে ফেরার জন্য নিঃশর্তে ক্ষমা চেয়ে কাজে যোগ দিতে হচ্ছে এবং কর্তৃপক্ষ ইচ্ছামতো বিভাগে তাদের কাজ দেবে — এটাও মেনে নিতে হচ্ছে। অর্থাৎ আন্দোলন করে শ্রমিকরা অন্যায় করেছে, এবং গ্রেপ্তার যাঁরা হয়েছেন তাঁরা অপরাধমূলক কাজ করেছেন এও মেনে নিতে হচ্ছে। আন্দোলনের নেতৃত্ব যদি আপসকামী না হতো তবে গুরগাঁওয়ের সাহসী শ্রমিকরা যে শক্তির জন্ম দিয়েছিলেন তা আরও বড় বিজয় অর্জন করতে পারত। কিন্তু মনে রাখা দরকার বর্তমানে, যখন কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম-সিপিআই, সংবাদপত্র-টিভি সমস্বরে আন্দোলনবিরোধী প্রচারের ঢেউ তুলে শ্রমিকশ্রেণীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে, তার পাল্টা যে আন্দোলন গুরগাঁওয়ের শ্রমিকরা গড়ে তুলেছেন এবং যতটুকু দাবি আদায় করেছেন, বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে তার তাৎপর্য বিরাট। সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকেই বুঝতে হবে অবমাননাকর চুক্তি নতুন আন্দোলনের জন্ম দেয়, যেমনটা আমরা দেখছি পশ্চিমবঙ্গের চা-বাগানে। সেখানে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী বাদে বৃহৎ ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ যে কালা চুক্তি করে পনের দিনের সফল ধর্মঘটকে আপসের মধ্য দিয়ে শেষ করেছে তার বিরুদ্ধে চা-বাগানে আবার শ্রমিকবিক্ষোভ জাগছে। গুরগাঁওয়ের শ্রমিকরাও যেখানে থেমেছেন সেখান থেকে শুরু করবেন ভবিষ্যতের লড়াই — আরও তীব্র, আরও দৃঢ় প্রত্যয়ে ভাস্বর।

গুরগাঁও থেকে পশ্চিমবঙ্গ

১৯৭৭ সালে ক্ষমতায় বসার আগেই প্রথম নির্বাচনী বেতার ভাষণে জ্যোতি বসু মালিক-পুঁজিপতিশ্রেণীকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে এ রাজ্যে জঙ্গি আন্দোলন হতে দেবেন না; যুক্তফ্রন্ট সরকারে থেকে ওসব এস ইউ সি আই করত। এবারের বামফ্রন্টে আর তারা নেই। অতএব নিশ্চিন্ত; মালিকরা নির্বিবাদে যথেচ্ছাচার ছাড়পত্র পেয়ে যাবেন। ক্ষমতায় বসার পরের বছরেই ১৯৭৮ সালে তারা কলকাতায় ডক শ্রমিকদের আন্দোলনে গুলি চালিয়ে ৭ জন শ্রমিককে হত্যা করে, ৫০ জন গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হয়। ভিক্টোরিয়া জুট মিলে শ্রমিক আন্দোলন ভাঙতে পুলিশ রাতের অন্ধকারে শ্রমিক বস্তিতে ঢুকে চটকল শ্রমিক ভিখারি পাশোয়ানকে তুলে নিয়ে যায়, আর কোনও খোঁজ মেলেনি তার, তদন্তে খুনী প্রমাণিত হলেও সংশ্লিষ্ট পুলিশকর্তাকে রক্ষা করেছে সরকার। বঞ্চনার বিরুদ্ধে চা-বাগান শ্রমিকদের সংগঠিত করে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এস ইউ সি আই সংগঠক ও শ্রমিক নেতা কমরেড তন্ময় মুখার্জী। ২০০০ সালের ২৮ আগস্ট পুলিশ-প্রশাসন ও চা-বাগান মালিকদের সংগঠিত পরিকল্পনায় তাঁকে টুকরো টুকরো করে কেটে বস্তায় ভরে নদীর জলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। চাঁদমনি চা বাগানকে ধ্বংস করে সেখানে উপনগরী গড়ে তোলার জন্য সরকার ও প্রমোটার চক্র চা-শ্রমিকদের উৎখাতের উদ্যোগ নিলে শ্রমিকরা আন্দোলন গড়ে তোলে। সেই আন্দোলন দমন করতে ২০০২ সালে বুদ্ধদেববাবুর পুলিশ নৃশংস অত্যাচার চালায় এবং গুলি করে একজন শ্রমিককে হত্যা করে। চটকল শ্রমিকদের আন্দোলন দমন করতে তাদের নেতা তথা এস ইউ সি আই নেতা কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য সহ অন্যান্য শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা খুনের মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়। মুর্শিদাবাদে বিড়ি শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাৎ করার প্রতিবাদে শ্রমিকরা মালিকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিল। পুলিশ মালিকের পক্ষে দাঁড়ায় এবং আন্দোলন দমন করতে ২০০২ সালের ১২ জুন গুলি চালিয়ে এক শ্রমিককে হত্যা করে, অনেককে আহত করে। নৈহাটি জুটমিলে গত বছর জুলাই মাসের ঘটনাটির উল্লেখ এক্ষেত্রে অত্যন্ত জরুরী। কী ঘটেছিল সেখানে? প্রথমে সিপিএম, সিপিআই, কংগ্রেসের ট্রেড ইউনিয়নগুলি মিল-মালিকদের সঙ্গে গোপন চুক্তি করে ব্যাপক শ্রমিক ছাঁটাইয়ের উদ্যোগ নেয়। তার বিরুদ্ধে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী অনুমোদিত 'বেঙ্গল জুটমিল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের' নেতৃত্বে শ্রমিক আন্দোলন গড়ে ওঠে। শ্রমিকদের ভাতে মারতে চটকল কর্তৃপক্ষ ১০ জুলাই কারখানার গেট বন্ধ করে দেয় এবং আন্দোলনে নেতৃত্বকারী ১১ জন শ্রমিককে বরখাস্তের নোটিশ জারি করে। তাই দেখে আন্দোলন আরও ব্যাপক রূপ নেয়। তখন সরকারের পুলিশ ও মালিকের দালালরা আক্রমণে নামে। গভীর রাতে বরখাস্ত শ্রমিকদের বাড়ি বাড়ি হানা দেয় এবং ৮ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলে ভরে দেয়, যদিও আন্দোলন তীব্র রূপ ধারণ করায় ২৮ জুলাই শেষপর্যন্ত কর্তৃপক্ষ সব দাবি মেনে নিলে আন্দোলন জয়যুক্ত

ছয়ের পাতায় দেখুন

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন

মস্কো ও লেনিনগ্রাদ রক্ষার লড়াই

(মহান নেতা স্ট্যালিনের আহ্বানে উজ্জীবিত হয়ে সোভিয়েট জনগণ ও লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন, আমেরিকা, ফ্রান্সের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদতে বলীয়ান দুর্ধর্ষ জার্মান ফ্যাসিস্টবাহিনীকে শেষপর্যন্ত ঠিক কীসের জোরে এবং কেমনভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছিল, শুধু সোভিয়েট ভূখণ্ড নয় — ইউরোপের বিস্তীর্ণ এলাকাগুলিকেও ফ্যাসিস্ট-দখলমুক্ত করেছিল, সেদিনের ভয়ঙ্কর মুহূর্তেও জনগণের প্রতি নেতার আস্থা ও বিশ্বাসকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল — সেই ইতিহাস আমাদের জানা দরকার। সোভিয়েটের জনগণ সমাজতন্ত্র চায়নি, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ভাঙতে চেয়েছে, সেজন্যই সমাজতন্ত্র ভেঙেছে — এই সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতিবিপ্লবী প্রচারের মোকাবিলায় আমাদের জানা দরকার কীভাবে সোভিয়েট জনগণ সমাজতন্ত্র রক্ষার জন্য সর্বস্ব পণ করে লড়েছে। শোষিত জনগণ এবং সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে লিপ্ত বিপ্লবীদের কাছে এ এক অমূল্য ইতিহাস — যা না জানলে সমাজতন্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে ধারণাই অপূর্ণ থেকে যাবে, যা জানলে শোষণমুক্তির লড়াই আরও ধারালো হবে। এই লক্ষ্য থেকেই সেদিনের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত আকারে ধারাবাহিকভাবে আমরা প্রকাশ করছি। — সম্পাদক, গণদাবী)

৭ম পর্ব

পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র সাধারণত সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সাধারণ মানুষের ঘনিষ্ঠতা চায় না। বরং তারা চায় — সামরিক বাহিনী সম্পর্কে মানুষের মধ্যে ভীতি ও দূরত্ব বিরাজ করুক, যাতে জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীকে ব্যবহার করতে অসুবিধা না হয়। যুদ্ধের সময় পুঁজিবাদী শাসকরা সাধারণত দেশরক্ষায় জনগণকে সামিল করে না, করতে চায়ও না। জনগণকে কেবল ত্যাগস্বীকার করতে বলে। এইসব রাষ্ট্রে জনগণ কেবল যুদ্ধের ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করে, মরে, সর্বস্ব হারায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ঠিক এর বিপরীত চিত্র। সামরিক বাহিনীও জনগণের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, তাদের পারস্পরিক গভীরতর সম্পর্ক গঠনে উৎসাহিত করা হয়। তাই জার্মানির ফ্যাসিস্ট বাহিনী যখন বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশকে আক্রমণ করেছে, তখন কেবল সেই দেশের মিলিটারির সঙ্গেই প্রধানত তাদের যুদ্ধ করতে হয়েছে, অসংগঠিত জনগণ সেখানে ভীত, ত্রস্ত, বিশৃঙ্খল, পলায়মান। কোন কোন দেশে যে ফ্যাসিবিরোধী পার্টিজান লড়াই ও গণপ্রতিরোধ হয়েছে, তা সংগঠিত করেছে সেদেশের কমিউনিস্টরা, তারা সোভিয়েটের প্রেরণায় লড়েছে। কিন্তু সোভিয়েট ইউনিয়নের ক্ষেত্রে জার্মানিকে লড়তে হয়েছে সমগ্র সোভিয়েট জনগণের বিরুদ্ধে। রণাঙ্গনে নিয়মিত সেনার পরিপূরক লড়াই করেছে সোভিয়েট জনগণ।

এ প্রসঙ্গে মার্কিন সাংবাদিক আনা লুই স্ট্রং লেখেন ঃ সোভিয়েটের প্রচণ্ড জনবলের কথা সকলেই স্বীকার করত। কিন্তু খুব অল্প লোকেই জানত, জনগণের এই বল বা শক্তি ইতিমধ্যে কতগুণ উন্নত হয়ে গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজে চিকিৎসার ব্যবস্থা, জন্মসময়ে শিশু ও মায়ের যত্ন নেওয়ার ব্যবস্থা এবং ছেলেমেয়েদের মধ্যে শারীরিক শিক্ষা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা থাকার ফলে জাতীয় স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। সেনাদপ্তরের তথ্যে দেখা গিয়েছিল যে, সৈন্যদের দেহের উচ্চতা ও ওজন, তাদের বুকের বহর ক্রমান্বয়ে বেড়ে যাচ্ছিল। রংরুটদের অর্থাৎ শিক্ষার্থী সেনাদের শিক্ষা ও সামরিক জ্ঞান প্রতি বছর বাড়ছিল। লক্ষ লক্ষ কাজ জানা মেয়ে দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অঙ্গীভূত হয়েছিল; সৈন্যবাহিনীর চিকিৎসা বিভাগে তো মেয়েদেরই প্রাধান্য ছিল। যানবাহন, সরবরাহ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগেও মেয়েরাই কাজ করত। অসামরিক লোকেরা সৈন্যদের সহযোগিতা করার জন্য শরীরের দিক থেকেও তৈরি হয়ে উঠেছিল। ষাট লক্ষ লোক 'প্রতিরক্ষা ও শ্রমের জন্য প্রস্তুত' বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিল; এ পরীক্ষার জন্য হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতরানো, লাফানো, নৌকা চালানো, বরফের উপর দিয়ে বরফ জুতো পায়ে হড়কে চলা ইত্যাদিতে পাকা হতে হত। অনেকেই প্যারাসুটের সাহায্য বিমান থেকে লাফিয়ে পড়া ও গ্লাইডার চালানোর প্রশিক্ষণ নিয়েছিল। বিনাবেতনে এ পাঠ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ছোট ছেলেমেয়েরাও তাদের 'কৃষ্টি ও বিশ্রাম' বাগিচায় গিয়ে প্যারাসুট-গম্বুজ থেকে লাফাতে ভালবাসত।

দেশরক্ষার জন্য যেমনটি প্রয়োজন যৌথ খামারগুলোর গড়নটিও ছিল তেমনি। প্রত্যেক খামারে কয়েকটি গ্রুপে কর্মীদল থাকত, প্রত্যেক দলের একজন করে নেতা ছিল। এরা সৈন্যবাহিনীর অঙ্গীভূত শ্রমিক দল হিসেবে কাজ করতে পারত, ...প্রত্যেক খামারের একটা করে নিজস্ব বেসরকারি প্রতিরক্ষা দলও ছিল। তারা ভালভাবেই গুলি চালাতে শিখত। তাদের নিজেদের অস্ত্রও ছিল। চোরাগোপ্তা লড়াইয়ের জন্য গেরিলাযোদ্ধাদের দল এইভাবে আগে থেকে গঠিত হয়েই ছিল।

আনা লুই স্ট্রং আরও লিখেছেন ঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় রাশিয়ার গ্রামাঞ্চলে জার্মানদের ট্যাঙ্ক আটকা পড়লে বা জার্মান বিমান নামতে বাধ্য হলে, স্থানীয় চাষী 'গেরিলারা' সেই ট্যাঙ্ক বা সেই বিমান চালিয়ে রণাঙ্গণের পিছনে পৌঁছে দিত। ১৯৪৩-এর মার্চ মাসে আমেরিকার লাইফ পত্রিকার যে বিশেষ সংখ্যা বেরিয়েছিল, তাতে লেখা ছিল, 'খামার যৌথকরণের জন্য যে মূল্যই দেওয়া হয়ে থাক না কেন, এই বৃহৎ খামারগুলো যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্ভব করেছিল। তার ফলে উৎপাদন দ্বিগুণ বেড়ে যায়, যন্ত্রশিল্পের জন্য চাষীদের মধ্যে থেকে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক পাওয়া যায়। তাদের না পেলে রাশিয়া তার যন্ত্রশিল্প গড়ে তুলতে পারত না, গোলাগুলি তৈরি করে জার্মানবাহিনীকে প্রতিরোধ করতে পারত না।' ...নিউ ইয়র্কের এক সংবাদপত্রের সম্পাদক আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'যে রুশ চাষীদের ট্রাক্টর দিলে চালাতে পারত না, মাঠে ফেলে মরচে ধরিয়ে দিত, তারাই দেখা যাচ্ছে এখন হাজার হাজার ট্যাঙ্ক খুব নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করছে। এটা কী করে সম্ভব হল!' আমি বললাম, 'এ হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ফল।' কিন্তু ৯ সপ্তাহ যুদ্ধের পর (আগস্টের শেষে) মস্কো যখন তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রকাশ করে জানাল যে তাদের ৭৫০০ কামান, ৪৫০০ বিমান এবং ৫০০০ ট্যাঙ্ক ধ্বংস হয়েছে, তখন পৃথিবীর লোক চমকে উঠল। এত ক্ষতির পরও যে বাহিনী লড়ে যেতে পারে, তার নিশ্চয়ই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম বা দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহের ব্যবস্থা আছে।"

এদিকে জার্মানরা উক্রাইনে প্রবেশ করার পর, শস্য কেটে নেওয়ার তাড়া পড়ল। চাষীদের প্রথম কাজ হল শস্য বাঁচানো। শিক্ষক, ছাত্র, অফিসের কেরানি — সকলেই দৌড়ালো চাষীদের সাহায্য করতে; এমনকী যেই ফ্রন্টে লড়াইয়ের গতি একটু কমে এলো, সৈন্যরা পর্যন্ত ফসল কাটতে লাগল। ১০ সেপ্টেম্বর নাগাদ জার্মানরা যখন উক্রাইনের মাঝখানে এসে পড়ল, ফসলের শতকরা ৬০ ভাগ তখন পূর্বদিকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। ঐ সময় লক্ষ লক্ষ চাষীও নিজেদের খামারের মোটর ট্রাক ও ট্রাক্টরগুলো চালিয়ে সেগুলোকে নিয়ে পূর্বদিকে সরে যায়; সৈন্যবাহী ফিরতি গাড়িতে করেও অনেকে চলে যায়। ইউরোপের বাস্তুচ্যুতদের মতো তাদের বেকার থাকতে হয়নি। তারা নিজেদের হাতিয়ার সঙ্গে করে আর কোথাও গিয়ে খাদ্য উৎপাদনের কাজে লেগে যায়। এরা যৌথ খামারের সদস্য, সবকিছু করেছেও যৌথভাবেই। আবার যুদ্ধের সমাপ্তির পরেও, অন্য দেশগুলিতে যখন দেখা গেছে — স্বামী-সন্তানহারা বিধবা ও বাবা-মা হারা অনাথ শিশুতে ছয়লাপ, ভিখারির মত তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরছে, অনাহারে মরছে — সেই সমস্যা সোভিয়েটে দেখা দেয়নি। কারণ, বিধবা, শিশু সহ সবাইকে বুকে টেনে নিয়েছিল যৌথ খামার; সেখানে যেমন তাদের কাজের ব্যবস্থা হয়েছিল, তেমনি সেখানেই তারা পেয়েছিল পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন, খাওয়া-পরা-শিক্ষা-চিকিৎসা, এমনকী অভাব অনটন — সবটাই তারা সমভাবে ভাগ করে নিয়েছিল। এই হল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য।

বহু চাষী জার্মান অধিকৃত এলাকায় থেকে যায়; গেরিলা দলের যোদ্ধা হয়ে পিছন থেকে তারা জার্মানদের উপর আঘাত হানতে থাকে। তারা চাইছিল, সবকিছু নিজেদের জন্য বাঁচাতে, শত্রুর নাগালের বাইরে নিয়ে যেতে। শত্রুরা এসে পড়েছে বুঝলে প্রত্যেকটি শিল্প-কারখানার শ্রমিকরা যন্ত্রপাতি খুলে ফেলত, তারপর যন্ত্রাংশগুলোকে গ্রীজ মাখিয়ে, প্যাক করে পূর্বদিকে চালান দিত; নিজেরা পূর্বমুখী হত। শ্রমিকরা নিজেদের যন্ত্রপাতি সঙ্গে করে পূর্বদিকে, সাইবেরিয়া বা উরাল অঞ্চলে তাদের জন্য নির্দিষ্ট করা নিরাপদ জায়গায় গিয়ে আবার কারখানা খাড়া করত।

জার্মানরা যখন খারকভ শহর অধিকার করে ফেলেছে, 'খারকভ ট্রাক্টর কারখানা' তখনও একদিনের জন্যও কাজ বন্ধ না রেখে হিটলারের বিরুদ্ধে ট্যাঙ্ক তৈরি করে গিয়েছে। কারখানার অধিকাংশ শ্রমিকই যন্ত্রপাতি খুলে নিয়ে পূর্বদিকে চলে যায়। কিন্তু পর্যাপ্ত শ্রমিক থেকে যায় আগেকার তৈরি যন্ত্রাংশগুলো জুড়ে শেষ ট্যাঙ্কগুলো তৈরি করে সেগুলো যুদ্ধরত লালফৌজের হাতে তুলে দেবার জন্য। খারকভে তাদের উৎপাদন বন্ধ হবার আগেই পূর্বদিকে তাদের নতুন তৈরি প্রধান কারখানার উৎপাদন শুরু হয়ে যায়।

সোভিয়েতের এই রণকৌশলের ফলে জার্মানরা কীরকম রিক্ত হয়ে পড়ে, সেকথা হাওয়ার্ড কে স্মিথের 'বার্লিন থেকে শেষ ট্রেন' গ্রন্থে বলা হয়েছে। জার্মানির সমরযন্ত্র ইউরোপের লুঠ করা সম্পদে ফেঁপে উঠেছিল; কিন্তু হিটলারবাহিনী রাশিয়ায় প্রবেশ করলে তাদের অনাহার শুরু হল, রাশিয়ার খাদ্য-পানীয় তারা দখল করতে পারল না। তাদের সৈন্যরা নীপার নদীর তীরে এসে, বিধ্বস্ত বাঁধের ওপারে বৃহৎ নীপার শিল্প কারখানাগুলোর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি দেখে আনন্দে নেচে উঠল। স্মিথ বলেছেন, সোভিয়েট ইউনিয়নে পা দেওয়ার পর থেকে তারা আর কোন কারখানা বাড়িকে গোটা অবস্থায় পায়নি। কিন্তু বাড়িগুলোয় ঢোকার পর তারা আবিষ্কার করল, মায় নাট-বল্টু পর্যন্ত সমস্ত যন্ত্রপাতি পূর্বদিকে চলে গিয়েছে। স্মিথ মন্তব্য করেছেন, 'এই হল সত্যিকারের প্রতিরক্ষা।' ৩রা জুলাই বেতারভাষণে স্ট্যালিনের আহ্বানকে অক্ষরে অক্ষরে রূপ দিয়েছিল সোভিয়েট জনগণ। তীব্র ভয়ঙ্কর আক্রমণের মোকাবিলা করতে করতে সোভিয়েট বারবার আবেদন জানালো — ব্রিটেন ও আমেরিকা যেন পশ্চিম রণাঙ্গনে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে লড়াই শুরু করে দেয়। তাহলে জার্মান বাহিনীর পুরো চাপ সোভিয়েটের উপর পড়বে না, বাহিনীর একটা অংশকে তখন হিটলার পূর্বের সোভিয়েট রণাঙ্গন থেকে সরিয়ে পশ্চিম রণাঙ্গনে পাঠাতে বাধ্য হবে এবং তাহলে লড়াইটা অপেক্ষাকৃত সহজ হবে। ব্রিটেন বলল — এখনও দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে লড়বার সময় হয়নি। সোভিয়েট বলল — তাহলে একটা কাজ অন্তত কর; রুমানিয়ার যে পোলেইস্তি তৈলক্ষেত্র থেকে জার্মানবাহিনীর বিমান ট্যাঙ্ক ও মোটর যানের সমস্ত তেল সরবরাহ হচ্ছে, বিমান থেকে বোমা মেরে সেই তৈলক্ষেত্রটা অন্তত ধ্বংস করে দাও। ব্রিটেন ও আমেরিকা তাতে গুরুত্বই দিলনা। অথচ সেই তৈলক্ষেত্রটিকে তারা বোমা দিয়ে ধ্বংস করে দিল ১৯৪৪ সালে, যখন সোভিয়েট ফৌজ নাৎসিবাহিনীকে তাড়িয়ে নিয়ে ঐ তৈলক্ষেত্রটির দখল নিতে যাচ্ছিল।

মস্কো ও লেনিনগ্রাদ রক্ষার লড়াই

১৯৪১-এর নভেম্বর নাগাদ, জার্মানরা উর্বর উক্রাইন প্রদেশ দখল করে নিয়েছিল, কিয়েভ লুঠ করেছিল। উত্তরের দুর্গ লেনিনগ্রাদ শহর অবরোধ করেছিল। তিনদিক থেকে মস্কো শহর ঘিরে ফেলেছিল। মস্কোর সুউচ্চ গম্বুজগুলো জার্মানরা দেখতে পাচ্ছিল। কিন্তু স্ট্যালিন মস্কোকে পৃথিবীর মধ্যে সুদৃঢ়তম দুর্গনগরী হিসেবে বহু আগেই গড়ে তুলেছিলেন নিঃশব্দে। আধুনিক দুর্গে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার আওতায় একটা বৃহৎ সৈন্যদলের স্বচ্ছন্দ গতিবিধির ব্যবস্থা থাকা জরুরি। মস্কোতে তা ছিল। লড়াইয়ের সমস্ত উপকরণ শহরের মধ্যেই তৈরি হত। বিদ্যুৎ উৎপাদন কারখানা চলত শহরের পিছনের কয়লাখনির দ্বারা। শহর রক্ষার বিমানগুলোর জায়গা ছিল শহরের ভিতরেই। সোভিয়েট সরকার বৈদেশিক দূতাবাসগুলোকে নিয়ে রণাঙ্গন থেকে অনেক দূরে ভোলগা নদীর তীরবর্তী কুইবিশেভ শহরে সরে যায়; ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের সঙ্গে উরাল অঞ্চলের মত দূর জায়গায় চলে যায়, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য মস্কো ছেড়ে কুইবিশেভে চলে যাওয়ার জন্য সেনাপতিদের হাজার অনুরোধ ফিরিয়ে দিয়ে স্ট্যালিন মস্কোতেই থেকে যান। মস্কোতে তাঁর উপস্থিতি জনগণের সামনে অনিবার্য বিজয়ের ইঙ্গিত হয়ে আসে। ১৯৪১-এর ৭ নভেম্বর জার্মানদের কামানগুলো যখন মস্কোর উপকণ্ঠে বজ্রনাদ করছিল, হিটলার যখন মস্কো অধিকৃত হয়েছে বলে বড়াই করছিলেন, স্ট্যালিন তখন রেড স্কোয়ারে নভেম্বর বিপ্লব দিবস উপলক্ষে সৈন্য পরিদর্শন করছিলেন। সেদিন মস্কোর লোকের আত্মবিশ্বাস দৃঢ় হল; তারা বুঝল, তাদের প্রধান সেনাপতি সহ তারাই সমস্ত জাতির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার কেন্দ্রে রয়েছে। ১৯৪১-এর ৩০ সেপ্টেম্বর শুরু হওয়া মস্কোর উপকণ্ঠের লড়াই চলে প্রায় ৭ মাস; ১৯৪২-এর ২০ এপ্রিল লালফৌজ শেষ পর্যন্ত জার্মানদের মস্কো থেকে ৬০ মাইল দূরে হটিয়ে দিল, আর তাদের ফিরে আসতে দিল না।

এই যুদ্ধে লেনিনগ্রাদকে আরও বেশি কষ্ট পেতে হয়েছিল, আড়াই বছর ধরে তাকে অবরুদ্ধ অবস্থায় কামানের জ্বলন্ত গোলার মুখে থাকতে হয়েছিল। তার মধ্যে কিছুদিন শোখনকার লোক দৈনিক পাঁচ স্লাইস রুটি আর দু-গ্লাস জল খেয়ে কাটিয়েছে। তাই খেয়েই তারা যুদ্ধোপকরণ তৈরি করত, জার্মানদের সঙ্গে লড়াইও করত। জার্মানদের কামানের গোলায় যতজন মারা গেল, তার চেয়ে বেশি মৃত্যু হল খাদ্যাভাবে। সোভিয়েট কৃষি বিজ্ঞানীরাও লেনিনগ্রাদে অবরুদ্ধ হয়ে না খেতে পেয়ে অনাহারে প্রাণ দিয়েছেন। সোভিয়েট জনগণের জন্য সংরক্ষিত বীজভাণ্ডার থেকে বীজ খেয়ে কিছুদিন তাঁরা বাঁচতে পারতেন, কিন্তু সে চেষ্টাও তাঁরা করেননি। তাঁরা তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন তবু জনগণের ভবিষ্যতের জন্য রক্ষিত শস্য স্পর্শ করেননি।

যুদ্ধের দ্বিতীয় বছরে জার্মানরা সবচেয়ে বেশিদূর এগিয়েছিল। কিন্তু তাদের গতিরোধ হয়েছিল ঃ উত্তরে — লেনিনগ্রাদে, মধ্যে — মস্কোতে, দক্ষিণে — স্ট্যালিনগ্রাদে। স্ট্যালিনগ্রাদ হয়েছিল সোভিয়েট প্রতিরক্ষার দক্ষিণের নোঙ্গর, লেনিনগ্রাদ যেমন ছিল উত্তরের।

(ক্রমশ)

পশ্চিমবঙ্গেও অবাধে শ্রমআইন লঙ্ঘিত হয়

চারের পাতার পর

হয়।

শুধু শ্রমিক আন্দোলন দমন নয়, রাজ্যের শ্রমজীবী জনগণের সকলপ্রকার আন্দোলনকেই তারা নির্মম পুলিশি অত্যাচার চালিয়ে দমন করছে। সিপিএম ফ্রন্ট সরকারে বসার ২ বছরের মধ্যেই ১৯৭৯ সালের ১৫ জুন, মূল্যবৃদ্ধি ও ভাষা শিক্ষানীতির প্রতিবাদে এসপ্ল্যানেড ইস্টে এস ইউ সি আই-এর আইন অমান্যে পুলিশি বর্বরতা বুঝিয়ে দিয়েছিল, গণআন্দোলনের বিরুদ্ধে এই সরকার পুলিশ লেলিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না। ১৯৯০ সালের ৩১ আগস্ট মূল্যবৃদ্ধি-ভাড়াবৃদ্ধি ও শিক্ষানীতি বিরোধী এস ইউ সি আই-এর আইন অমান্যে গুলি চালিয়ে কিশোর কমরেড মাধাই হালদারকে হত্যা করে, আরও ৩২ জন গুলিবিদ্ধ হয়। এরপর প্রাথমিকে ইংরেজি পুনঃপ্রবর্তনের দাবিতে এবং হাসপাতালে বর্ধিত চার্জ - শিক্ষায় বর্ধিত ফি - বিদ্যুতে বর্ধিত মাশুল প্রত্যাহারের দাবিতে যেসব আন্দোলন হয়েছে ও হচ্ছে — প্রায় সর্বত্র পুলিশি অত্যাচার নেমে এসেছে। প্রকাশ্য রাজপথে মহিলা আন্দোলনকারীদের শ্লীলতাহানি ও বর্বর অত্যাচার যেন পুলিশের পেশায় পরিণত। গত ১০ জুন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদের অনশন আন্দোলন ভাঙতে রাতের অন্ধকারে পুলিশ যে ছাত্রদের পেটাল, সেও তো এই পশ্চিমবঙ্গেই! সম্প্রতি ১৯ জুলাই বিদ্যুতের মাশুলবৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় আন্দোলনে বিশেষ করে হুগলিতে পুলিশ যে বর্বরতা দেখিয়েছে, তা টিভি ও সংবাদপত্র মারফৎ রাজ্যবাসী দেখেছেন। শেওড়াফুলি, উত্তর ২৪ পরগণার অশোকনগরে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের পুলিশ রাস্তায় ফেলে পিটিয়ে রক্তাক্ত করেছে, তারপর পুলিশের গাড়িতে তুলে পিটিয়েছে, থানা লকআপে ঢুকিয়ে পিটিয়েছে, মেয়েদের সঙ্গে লকআপে অতি জঘন্য আচরণ করেছে, এবং সবশেষে গণআন্দোলনকারীদের উপর পুলিশকে হত্যা-চেষ্টার মিথ্যা অভিযোগ চাপিয়ে জামিন অযোগ্য ধারায় জেলে আটক করেছে। এই আন্দোলনে পুলিশের উপর এক খণ্ড ইটও পড়েনি, তবুও পুলিশ এমন বর্বর আচরণ করল কেন? কারণ, তারা জানে, সরকার এটাই চায়।

এসবই পশ্চিমবাংলায় গুরগাঁও-এর প্রতিচ্ছবি নয় কি? গুরগাঁওয়ের সাথে এ-রাজ্যের সরকার ও পুলিশ-প্রশাসনের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক কোথায়? ফারাক কেবল এটাই যে, হরিয়ানার ঘটনায় সিপিএম, সিপিআই নেতারা যে শ্রমিকদরদের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন, সংসদে ও টিভি ক্যামেরার সামনে হৈ চৈ করছেন, পশ্চিমবঙ্গে এমন ঘটনায় তাঁরা শুধু নীরব থাকেন, তাই নয়, কোনভাবেই ঘটনা যাতে সর্বভারতীয় ইস্যু না হতে পারে, তার ব্যবস্থা করেন, সেখানে ব্যর্থ হলে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের আন্দোলনকে ''প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্ত'' বলে দাগা মেরে দেন।

হন্ডা কোম্পানি প্রসঙ্গে সিপিএম নেতা, রাজ্যসভার সদস্য নীলোৎপল বসু বলেছেন, আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ভারতের শ্রমআইন তৈরি। আর সেই আইন দেশের সমস্ত কোম্পানিকেই মানতে হবে।'' বলেছেন — গুরগাঁওয়ের বেশিরভাগ কারখানাতে নানাভাবে শ্রমআইন লঙ্ঘিত হচ্ছে। ...আইন লঙ্ঘিত হলে দায়ী থাকবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারই।'' (গণশক্তি, ২৮-৭-০৫)

অথচ নীলোৎপলবাবুরা যে পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘ ২৮ বছর ক্ষমতাসীন সেখানেই শ্রম আইন সম্ভবত সবচেয়ে বেশি লঙ্ঘিত হচ্ছে। তাঁরা দায়ী নন? ৯ ডিসেম্বর সিপিএম রাজ্য সরকার নিজেই বিধানসভায় ''দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্পেশাল ইকনমিক জোন বিল - ২০০৩' পাশ করিয়ে নিয়েছে। তাতে সল্টলেকের 'মণিকাঞ্চন' ও তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টর এবং ফলতার মুক্ত বাণিজ্য কেন্দ্রকে তারা বিশেষ বাণিজ্য অঞ্চল ঘোষণা করেছে — যার অর্থ, সেই জায়গাগুলিতে দেশের শ্রম আইন প্রযোজ্য নয়। মজুরি বা বেতন, কাজের ঘণ্টা — সমস্ত কিছুই সেখানে মালিকের হুকুমেই নির্ধারিত হবে। এরা দ্বারা কি বোঝায় যে, সিপিএম সরকার সর্বত্র শ্রমআইন কার্যকর হোক চায়? 'সংবাদ প্রতিদিনে'র (৫ জুলাই ২০০৫) এক সাংবাদিক এ রাজ্যের শ্রমিকদের অবস্থা বোঝাতে গিয়ে লিখছেন, ''সরকার নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরি প্রায় কোনও নতুন চাকরিতে আর কার্যকর নয়। ঢাকঢোল পেটানো তথ্য-প্রযুক্তি শিল্পে ইঞ্জিনিয়ার পর্যন্ত কাজ করছে ঠিকা চুক্তিতে — এমনকী তিনহাজার টাকা মাস-মাইনেতেও। আটঘণ্টা কাজ এখন বামপন্থীরা কেবল মে-দিবসেই মনে করার চেষ্টা করেন।''

রাজ্য সরকারের নিজেদের দেওয়া হিসেবে দেখা যাচ্ছে, এ রাজ্যে শ্রমিক-ধর্মঘটের সংখ্যা অতি সামান্য, সে তুলনায় মালিকদের লকআউট ব্যাপক। ১৯৯০-১৯৯৬ এই ৭ বছরের হিসেবে ধর্মঘট মাত্র ১৫৩, অথচ লকআউটের সংখ্যা ১১৬৩। ১৯৯৬-২০০৩ এই ৭ বছরে শ্রমিক ধর্মঘট ১৯৮, আর লকআউট ১১৭৮। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, বছরের পর বছর রাজ্যের শ্রমিকরা ধর্মঘট করেনি, বা বলা ভাল যে, সিটু ও তাদের দোসর শ্রমিক সংগঠনগুলি শ্রমিকদের ধর্মঘট আন্দোলন করতে দেয়নি। অথচ মালিকরা তাদের আক্রমণ বাড়িয়ে গেছে, লকআউট করে হাজার হাজার শ্রমিককে পথে বসিয়েছে। সরকার নির্বিবাদে মালিকদের যথেচ্ছাচার চালাতে দিয়েছে।

শুধু কি তাই? শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকা আত্মসাতের ঘটনাতেও পশ্চিমবঙ্গ বরাবর রেকর্ড সৃষ্টি করে চলেছে। ২০০৪-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্য সরকারের নিজের দেওয়া হিসেব বলছে, রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা শ্রমিকদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের ৪৬৯ কোটি টাকা মেরে দিয়েছে (সূত্র ঃ লেবার ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল)। শ্রমিকদের চিকিৎসার জন্য শ্রমিকদেরই বেতন বা মজুরির থেকে কেটে রাখা ইএসআই ফান্ডের শত শত কোটি টাকা এ রাজ্যেই লোপাট হয়ে গেছে। ২০০৩-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত শুধুমাত্র ৬৩টি চটকলে এই বাবদ বকেয়া ১২৬ কোটি টাকা। (সূত্র ঃ বাংলার শিল্প ও শ্রমিকের ইতিবৃত্ত — নাগরিক মঞ্চ) সিপিএম সরকার সেক্ষেত্রে কী ভূমিকা পালন করেছে? এ প্রসঙ্গে ১৯৯৭ সালেই রিপোর্ট করতে গিয়ে এক সাংবাদিক বন্ধু লেখেন, ''শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থরক্ষার কথা যারা বলে সেই শাসকগোষ্ঠীর বামফ্রন্ট গত-দুদশক ধরে শিল্পের পরিচালকগোষ্ঠীর কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ বকেয়া আদায়ে কোন উদ্যোগ নেয়নি। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি রাজিন্দর সাচার-এর নেতৃত্বে শ্রমিকদের বর্তমান অবস্থা খতিয়ে দেখতে যে অনুসন্ধান কমিটি হয়েছে, তার সাম্প্রতিক রিপোর্টে একথা বলা হয়েছে। ...তথ্যানুসন্ধানী কমিটির কাছে প্রায় ৬০টি অভিযোগ এসেছে। ...তাতেই যে তথ্য এসেছে তা যথেষ্ট অবাক হওয়ার মত। বহুক্ষেত্রে শ্রমিকরা ন্যূনতম মজুরি দূরের কথা, নিয়মিত মজুরিও পায় না।'' (সংবাদ প্রতিদিন, ৭-৩-৯৭) একই পত্রিকা (১৪-৭-৯৬) সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ''গত দশ বছরে পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ হয়ে যাওয়া বিভিন্ন কারখানার কত শ্রমিকের অনাহারে মৃত্যু হয়েছে এবং কতজন আত্মহত্যার প্রাণের জ্বালা জুড়িয়েছেন, ... সেই তালিকা যে ছবি তুলে ধরে তা অত্যন্ত মর্মান্তিক। ১০ বছরে ৫০০ জনের যদি অনাহারে মৃত্যু হয় এবং ৭৫ জনের আত্মহত্যার পথ বেছে নেন, তবে সে রাজ্যের শিল্পক্ষেত্রের এক ভয়াবহ রূপ প্রকট হয়ে পড়ে, তাতে সন্দেহ নেই।

''যা আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়, তা হল, চিরবিদায়ের ঘটনা ঘটতে থাকলেও তার জন্য চোখের জল ফেলার বিশেষ লোকও আজকাল পাওয়া যাচ্ছে না। ...নানা সমীক্ষায় এই সত্য আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে অযোগ্য পরিচালন ব্যবস্থা, মালিকদের অসাধুতাই শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। ...যা বিস্ময়ের তা হল, এইসব বেকানুনি, শিল্পস্বার্থবিরোধী কাজ কারবার করেও তাঁদের অনেকে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন ও সরকার হয়ে রয়েছেন অসহায় দর্শক।'' বুদ্ধদেববাবুদের কাছে প্রশ্ন, কংগ্রেস শাসিত হরিয়ানার গুরগাঁও-এর শ্রমিক বঞ্চনার থেকে সিপিএম শাসিত পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক বঞ্চনা কোন্ দিক দিয়ে কম?

সিপিএম ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, গুরগাঁওতে শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকার দেওয়া হচ্ছে না, এটা অন্যায়। নিঃসন্দেহে তা অন্যায় ও অপরাধও। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি? এখানে কি তথ্যপ্রযুক্তি সেক্টরে ইউনিয়ন গঠনের অধিকার আছে? আবার যেখানে ইউনিয়ন আছে, সেখানে সিটু, আই এন টি ইউ সি,

আটের পাতায় দেখুন

২৬ জুলাই ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর প্রতিবাদ মিছিল। ধর্মতলায় হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

দু'একটি নমুনা মাত্র

- ১৯ নভেম্বর '৭৮ ঃ ধর্মঘটরত ডক শ্রমিকদের ওপর পুলিশী আক্রমণ। ধর্মঘট ভাঙতে এলোপাথাড়ি লাঠি, ৫০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস ও গুলি। নিহতের সংখ্যা সরকারি মতে ৩ জন বেসরকারি মতে ৭ জন। (দ্রঃ যুগান্তর ৪-১০-৭৯)
- জুন ১৯৭৮ ঃ রাজ্যে বিদ্যুৎ সঙ্কটের জন্য শ্রমিক কর্মচারী আন্দোলনকে দায়ী করে সাঁতালদি বিদ্যুৎ কেন্দ্রে জরুরি অবস্থার কুখ্যাত পুলিশ অফিসার অমল দত্তকে পাঠানো হয়। ১১০০ কর্মচারীর জন্য ২০০০ পুলিশ নিয়োগ করা হয়।
- ৩১ জানুয়ারি '৭৯ ঃ মরিচঝাঁপিতে অসহায় উদ্বাস্তুদের ওপর গুলি চালিয়ে ১০ জন হত্যা।
- ১৯৭৯-র ১৫ জুন কর দর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই-র গণআইন অমান্যে পুলিশের নৃশংস আক্রমণ। আহত ৫০০, গুরুতর আহত ২০০, নিখোঁজ অসংখ্য।
- ৩ অক্টোবর ১৯৭৯ ঃ পোর্ট শ্রমিকরা বকেয়া ইনসেন্টিভের দাবিতে ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ভাঙতে বিশাল পুলিশ বাহিনী পাঠায় বামফ্রন্ট সরকার। ধর্মঘট ভাঙতে সিটুও ফ্যাসিস্ট আক্রমণ নামিয়ে আনে।

  পুলিশ নির্মমভাবে লাঠি ও ৫০ রাউণ্ড কাঁদানে গ্যাস চালায়। ৪৭ রাউণ্ড গুলি চলে, ৪ জন শ্রমিক মারা যায়, বেসরকারি হিসাবে মৃতের সংখ্যা ৭। যে পুলিশ বর্বরোচিত আক্রমণ চালায় সেই পুলিশ কমিশনারকেই দায়িত্ব দেওয়া হয় ঘটনার তদন্তের।
- ১৯ আগস্ট '৮৩ ঃ পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুরে এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে বাসভাড়াবৃদ্ধি প্রতিরোধে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের উপর পুলিশের গুলি চালনায় হাবুল রজক ও শোভারাম মোদক নিহত হন।
- ২৮ সেপ্টেম্বর '৯২ ঃ বাসট্রামের ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে মহাকরণের সামনে বিক্ষোভে পুরুষ পুলিশ মহিলা কর্মীদের শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, ব্লাউজ ছিঁড়েছে, পাশবিক উন্মত্ততায় বিবস্ত্র করেছে, শরীরের নানা স্থানে আঁচড় কেটেছে, ভ্যানে তুলে তলপেটে বুটের লাথি মেরেছে।
- ২ নভেম্বর '৯২ ঃ হরিহরপাড়ায় সমাজ-বিরোধীদের অত্যাচারের প্রতিবাদে নাগরিক কল্যাণ পরিষদের আন্দোলনে পুলিশের গুলিবৃষ্টি। গণহত্যার বলি হয় ৯ জন। আহত অনেক।
- ২৬ জুন ২০০২ ঃ শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন চাঁদমনি চা-বাগান উচ্ছেদ করে উপনগরী গড়ে তোলার প্রতিবাদে চা শ্রমিকদের আন্দোলনে পুলিশ টিয়ারগ্যাস, লাঠি, গুলি চালায়। শহীদ হন বাগান শ্রমিক রামপ্রসাদ ভক্ত এবং রঞ্জিৎ জয়সওয়াল।
- ১৯ সেপ্টেম্বর '৯৭ ঃ পেট্রোপণ্য ও বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে ১৬ দফা দাবিতে শান্তিপূর্ণ গণআইন অমান্যে পুলিশ নৃশংসভাবে লাঠিচার্জ করে, টিয়ারগ্যাস চালায়, ১১৩ জন আহত, ৫ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, ৪ জনকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে পাঠানো হয়।
- ৮ মে, ২০০০ ঃ কৃষিপণ্যের দাম না পেয়ে হলদিবাড়ীতে কৃষক বিক্ষোভে পুলিশ বেপরোয়া লাঠি চালায়। ১৫০ রাউণ্ড গুলি চলে, গ্রেপ্তার ২৯ জন, আহত অসংখ্য।

৫ই আগস্টের সংকল্প

একের পাতার পর

পুঁজিবাদীরা তাদের সর্বগ্রাসী সংকট ও বিশ্বায়নের সমস্ত বোঝা গরীব মানুষের ওপর নামিয়ে নিয়ে আসছে। এই অসহনীয় অবস্থা থেকে মুক্তি পেতে হলে বিপ্লবী আন্দোলনগুলিকে দেশের অভ্যন্তরে দ্রুত শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে হবে। অথচ, আমরা দেখছি, বর্তমানে চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবাদের প্রভাব যেভাবে গোটা সমাজজীবনকে কলুষিত করছে তা বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রধান বাধা হিসাবে কাজ করছে। এমনকী ভারতবর্ষের মত দেশেও আজ ভোগবাদের কুপ্রভাব এমনভাবে বেড়ে চলেছে, যার ফলে ভোগসর্বস্ব জীবন এমনকী দেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান-সন্ততিদেরও উন্নত আদর্শের আকর্ষণ থেকে দূরে ঠেলে দিতে চাইছে। এই অবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার প্রয়োজনে প্রতিটি বিপ্লবীর জীবনে আজ ব্যক্তিস্বার্থকে সামাজিক স্বার্থের সাথে বিলীন করার সংগ্রামটি অবশ্য জরুরি কর্তব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, ''কোন আদর্শ বড় হলেই তাকে বাস্তবে রূপায়িত করা যায় না, যদি সেই আদর্শকে রূপায়িত করবে যে মানুষগুলো তারা সেই আদর্শকে রূপায়িত করবার মত বড় মানুষ এবং উন্নত চরিত্রের না হয়।''

কমরেড ঘোষ বলতেন, অতীতে কম্যুনিস্ট আন্দোলনে উন্নত স্তরের কম্যুনিস্ট তাঁদেরই বোঝাত, যারা ব্যক্তিস্বার্থকে গৌণ করে দল ও বিপ্লবের স্বার্থকে মুখ্য বলে বিবেচনা করে। কিন্তু তিনি দেখিয়েছেন, আজকের দিনে চূড়ান্ত ও নিকৃষ্ট ব্যক্তিবাদের যুগে এ দিয়ে বিপ্লবের কাজ চলবে না। তাই তিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন যে, আমাদের জীবনের সংগ্রামটা এমনভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে আমরা স্বচ্ছন্দে, সানন্দে ও বিনা শর্তে ব্যক্তিস্বার্থকে সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী, বিপ্লব ও দলের স্বার্থের সাথে বিলীন করে দিতে পারি, যাতে বিপ্লবের স্বার্থের বাইরে আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ বলে কিছু অবস্থান না করে। তিনি একথাও শিখিয়েছেন যে, একমাত্র এই স্তরে উন্নীত নেতাদের হাতেই দলের নেতৃত্ব তুলে দেওয়া দরকার।

অন্যদিকে তিনি শিখিয়েছেন, দলের অভ্যন্তরে আদর্শগত ঐক্যের সাথে সাংগঠনিক ঐক্যের মিলন ঘটাতে হবে — যেটাকে লেনিন 'সর্বহারা গণতন্ত্র ও একেন্দ্রীকরণের সংমিশ্রণ' (fusion between proletarian democracy and centralism) বলেছেন। এর জন্য প্রয়োজন নেতা-কর্মীদের মধ্যে প্রতিনিয়ত মত বিনিময়, আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলা। সুতরাং, মার্কসবাদ তথা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে নেতা-কর্মীদের প্রতিনিয়ত একসঙ্গে কাজ করা, প্রতিনিয়ত মতবিনিময় করা এবং প্রতিনিয়ত মেলামেশার অভ্যাস (constant common activity, constant common discussion and constant common association) গড়ে তুলতে হবে। এটাই হ'ল নেতা-কর্মীদের মধ্যে দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলার যথার্থ পথ। নাহলে সম্পর্ক হয়ে পড়বে যান্ত্রিক — দ্বান্দ্বিক নয়। কমরেডদের সদাসর্বদা একথা মনে রাখতে হবে যে, এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং তাকে অভ্যাসে আয়ত্ত করার জন্য নিজেদের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে উন্নত কমিউনিস্ট চরিত্রের মান অর্জন করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন যৌন জীবন সহ প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটি সমস্ত দিক পরিব্যাপ্ত করে নিরন্তর সচেতন তীব্র সমাজতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিচালনা করা। আমি আগে যে গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের কথা বলেছি সেটাকে শুধু বজায় রাখাই নয়, তাকে রক্ষা করার জন্যও এটা অত্যাবশ্যক। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, আপনারা এর গুরুত্ব অনুধাবন করে নিরন্তর এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবেন। গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা একটি সাচ্চা কম্যুনিস্ট পার্টির কাঠামো হবে অত্যন্ত সুদৃঢ় ও ইস্পাত কঠিন। এই ঐক্যকে সুদৃঢ় ও অটুট রাখতে হলে প্রয়োজন নেতৃত্বের প্রতি প্রশ্নাতীত আনুগত্য। কারও কারও একথা মনে হতে পারে যে, প্রশ্নাতীত আনুগত্য মানে হ'ল অন্ধ আনুগত্য। তিনি দেখিয়েছেন, এই ধারণা সঠিক নয়। কেননা মূল সমস্যা হ'ল অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করা। অন্ধভাবে নেতৃত্বকে মেনে নেওয়াও যেমন অন্ধতা, আবার অন্ধভাবে বিরোধিতা করাও অন্ধতা। এর একটি হ'ল অপরটির উল্টো পরিণতি। আমাদের দল আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট আন্দোলনেও সকল সময়ে এই অন্ধতার বিরুদ্ধে লড়াই করে এসেছে। একজন নেতা খুব বড় বলেই তিনি ভুল করতে পারেন না — এই ধারণা ভ্রান্ত। কেননা কেউই ভুলের উর্ধ্বে নয়। এই অমূল্য শিক্ষাগুলো স্মরণে রাখতে হবে।

আপনারা সকলেই জানেন, ইতিমধ্যে আমাদের দলের অনেকগুণ শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছে। অন্যদিকে সমস্ত ভোটসর্বস্ব রাজনৈতিক দলগুলো গণআন্দোলনকে বিপথগামী করে চলেছে। এদের মধ্যে যেমন কংগ্রেস, বিজেপির মত দক্ষিণপন্থী দলগুলো রয়েছে — তেমনই রয়েছে তকমাধারী বামপন্থী বা সিপিআই(এম), সিপিআই'র মত কম্যুনিস্ট নামধারী দলগুলো। তাদের উদ্দেশ্য হ'ল, একদিকে জনমনের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতায় আসীন হয়ে উজির-নাজির হওয়া, অপরদিকে সাচ্চা কম্যুনিস্ট পার্টি এস ইউ সি আই-র ক্রমবর্ধমান অগ্রগতিকে যথাসম্ভব স্তিমিত করা। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, পুঁজিবাদী শোষণের জ্বালা-যন্ত্রণা আজ এমনভাবে জনজীবনকে পর্যুদস্ত করে চলেছে যে তাকে ভিত্তি করে ব্যাপক জনসাধারণ আমাদের দলের নেতৃত্বে পরিচালিত গণআন্দোলনগুলিকে স্বাভাবিকভাবেই কোথাও কোথাও সমর্থন করছে, আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে, আবার কোথাও কোথাও এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করছে। আর আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের নিষ্ঠা-কর্তব্যপরায়ণতা ও উন্নত রুচি-সংস্কৃতির আকর্ষণে সাধারণ মানুষ অপর দলের হীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের দলের প্রতি ক্রমাগত আকৃষ্ট হচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই একথা স্বীকার করতে হবে যে, আমাদের দলের নেতা-কর্মীদের দায়িত্ব ও দায়ভার অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া আপনারা একথাও সকলেই জানেন যে, কমরেড ঘোষের উন্নত চিন্তাকে শুধু আমাদের দেশেই নয়, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বিভিন্ন দেশে যেখানেই পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে, তাদের অনেকের কাছে কমরেড শিবদাস ঘোষ আন্তর্জাতিক স্তরের প্রথম সারির কম্যুনিস্ট নেতা হিসেবে বিবেচিত হয়েছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনা আমাদের বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। একথা স্বীকার করতেই হবে যে, কমরেড শিবদাস ঘোষ জীবিত থাকাকালে আমাদের সামনে আজকের মত এই সমস্ত সুযোগ বা সম্ভাবনা দেখা দেয়নি। সেইদিক থেকে বলতে গেলে একথা স্পষ্ট যে, আজ আমাদের সামনে একটা অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে। এই অনুকূল কথাটার মানে এই নয় যে, সকলেই এক্ষুনি অন্যান্য দলের প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে আমাদের দিকে চলে আসতে শুরু করেছে। আমি একথা বলতে চাইনি। আমি বলতে চেয়েছি, অবস্থা আমাদের পক্ষে আগের থেকে অনেক বেশি অনুকূল। কিন্তু আমি অত্যন্ত দুঃখের সাথে লক্ষ্য করছি যে, আমরা এই অনুকূল পরিস্থিতির যথার্থ সদ্ব্যবহার করতে পারছি না। এর একটা প্রধান কারণ, একটি বিপ্লবী দলের ক্ষেত্রে যে আদর্শগত আন্দোলনের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া দরকার সেটা সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হচ্ছে। একটার পর একটা প্রোগ্রাম বা কর্মসূচির চাপে এবং প্রতিনিয়ত টেক্‌নিক্যাল কাজের বেড়াজালে নেতারা ব্যস্ত থাকছেন এবং কর্মীদেরও জড়িয়ে ফেলছেন। আদর্শগত আন্দোলন এবং গণআন্দোলনের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন না হওয়ার কারণে আদর্শগত সংগ্রাম মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। এই অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন করতে হবে। এর সাথে আর একটা কথা মনে রাখতে হবে, তা হচ্ছে, আমাদের নেতাদের শুধুমাত্র ইনফরমেটিভ নলেজের অধিকারী বা টেক্‌নিক্যালি ফিনিশ্‌ড হওয়া নয়, তাঁদের হতে হবে সত্যিকারের জ্ঞানী। এই জ্ঞান উত্তরোত্তর যাতে সমৃদ্ধ হয়, সবদিক থেকে গুরুত্ব দিয়ে তার জন্য সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।

তাই কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে গোটা পার্টি ও গণসংগঠনগুলোকে পুনরুজ্জীবিত ও সংহত করার সংগ্রামে নিয়োজিত হওয়ার যে আহ্বান জানিয়েছে তাকে সর্বতোভাবে কার্যকর করার জন্য গোটা পার্টিকেই সক্রিয়ভাবে নামতে হবে। কিন্তু এই নামার ক্ষেত্রে নেতৃত্বের ভূমিকাই হবে সর্বপ্রধান। এই কর্মসূচীকে একটা জীবন্ত আন্দোলনের রূপে পার্টির অভ্যন্তরে পরিচালনা করতে হবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য এবং রাজ্য কমিটির সম্পাদক যাঁরা এখনও গতানুগতিক কর্মরীতির শিকার হয়ে আছেন তার থেকে তাঁদের নিজেদের এক ধাক্কায় মুক্ত করতে হবে। মনে রাখতে হবে, কমরেড শিবদাস ঘোষ পার্টি গঠনের সূচনাপর্ব থেকে তাঁর সারাটা জীবন দিয়ে এদেশের মাটিতে লেনিনিস্ট মডেলের একটা শ্রমিকশ্রেণীর দল গড়ে তুলেছেন। এই দল গড়ে তোলা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন, নেতৃত্বকে অন্যান্য বিষয়ের সাথে অবশ্যই দলের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তর থেকে শুরু করে নেতা ও সংগঠকদের মধ্যে উপযুক্ত বিপ্লবী মানের যেখানে যেমন অবনমন ঘটেছে বা ঘটছে সেগুলোকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে সেগুলির বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। যেমন, স্টাফ মেম্বাররা কমিউনে, সেন্টারে বা ভাড়া বাড়িতে যেখানেই থাকুন, একটা সময় সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পারিবারিক জীবনের বন্ধন ছিন্ন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যেই কেউ কেউ আবার দেখা যাচ্ছে, বিবাহিত জীবনে সন্তান-সন্ততি হওয়ার পরে পারিবারিক জীবনযাপন করছেন। ব্যক্তিসম্পত্তি-জাত মানসিকতা (private property mental complex) থেকে নিজেদের মুক্ত করতে না পারার ফলেই এটা হচ্ছে। তাঁরা যদি এই মানসিকতা থেকে নিজেদের অবিলম্বে মুক্ত করতে না পারেন, তাহলে কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের স্টাফ মেম্বারশিপ বাতিল করতে বাধ্য হবে। একটা সময়সীমার মধ্যে এটা সংশোধন করতে না পারলে তাঁদের স্টাফ মেম্বারশিপ রাখা যাবে না।

বিভিন্ন ঘাটতি বা ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার সংগ্রামের যে কর্মসূচি এবং কতকগুলো সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের যে লক্ষ্যমাত্রা কেন্দ্রীয় কমিটি দিয়েছে, সেটা ছয় মাসের মধ্যে কতটা পূরণ করা সম্ভব তা নির্দিষ্ট করে তাকে রূপায়িত করার জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে হবে। ছয় মাস পর এগুলির মধ্যে কী কী করা গেল না এবং কোন্ কোন্ কারণে করা গেল না, পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে তা সুনির্দিষ্টরূপে চিহ্নিত করে পরবর্তী ছয় মাসের নির্ধারিত কর্মসূচিগুলির সাথে সেগুলি সংযোজিত করতে হবে এবং একত্রে সবটা পূরণ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে। এই সময়ের মধ্যেও এমনটা কোথাও যদি দেখা যায় যে, সবটা সঠিকভাবে পূরণ করা সম্ভব হয়নি তাহলে আবার দেখতে হবে, আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কেন হয়নি। তারপর কোথায় কী কারণে ফাঁক রয়ে গেছে সেটা বুঝে নিয়ে কালবিলম্ব না করে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে অবশ্যই সমস্তটাই পূরণ করতে হবে। এইভাবে এক থেকে দেড় বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক প্রকাশিত 'নতুন প্রাণশক্তিতে উদ্দীপিত হয়ে পার্টি ও গণসংগঠনগুলিকে

পুনরুজ্জীবিত ও সংহত করার সংগ্রামে নিয়োজিত হোন' — পুস্তিকাটিতে এই আহ্বান জানিয়ে যেসব নির্দিষ্ট কর্মসূচি আপনাদের সামনে কেন্দ্রীয় কমিটি রেখেছে সেগুলিকে কার্যকর করতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষ যেভাবে কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে শুরু করে রাজ্য, জেলা, লোকাল ও সেলবডিগুলোকে ক্রিয়াশীল করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে বর্তমানে আমাদের কোথায় কোথায় এবং কী কী কারণে ঘাটতি হচ্ছে সেটা চিহ্নিত করতে হবে। সেটা ত্রুটিই হোক, বা বিচ্যুতিই হোক, তাকে অবিলম্বে দূর করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে। এ কাজকে সফল করতে হলে চাই দলের অভ্যন্তরে যৌথ সংগ্রাম পদ্ধতি পরিচালনা করা, যাকে আমরা কালেকটিভ ফাংশনিং বা বডি ফাংশনিং বলি। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, কোন কোন নেতা একা একা অনেক কাজ করতে পারেন, একা একা কাজের ক্ষেত্রে তাঁদের উদ্যোগ, পরিকল্পনা কোন কিছুরই অভাব হয় না। কিন্তু যৌথভাবে কাজ করার সময় তাঁরা প্রায়শই তেমনটি করে উঠতে পারেন না। এর ফলে স্তরে স্তরে বডি ফাংশনিং ব্যাহত হয়। তাই তিনি তাঁদের একা একা চিন্তা করা এবং একা একা কাজ করার অভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আমাদের পার্টির অবস্থানের প্রকৃতিই হচ্ছে যৌথ — ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত যৌথ নেতৃত্ব, যৌথ জীবন, যৌথ কর্মকাণ্ড। এ সবই হচ্ছে পার্টির প্রাণসত্তা এবং সমস্ত শক্তি দিয়ে এটা পার্টির জীবনে সক্রিয় ও সজীব করে তুলতে হবে।

আপনারা জানেন, মার্কসবাদের একটা মৌলিক শিক্ষা হচ্ছে, প্রতিটি বস্তু বা বিষয়ের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাইরের দ্বন্দ্ব ও ভিতরের দ্বন্দ্ব — এই দুই দ্বন্দ্বই ক্রিয়া করলেও গুণগত পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ভেতরের দ্বন্দ্বই নিয়ামক শক্তি হিসাবে কাজ করে। আবার দেখা যায়, কখনও কখনও বাইরের দ্বন্দ্ব, অর্থাৎ পার্টির অভ্যন্তরে নেতা-কর্মীদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সেখানে ক্ষেত্রবিশেষে নেতাদের ভূমিকা একজন কর্মীর ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন এনে দেয়, এমনকী মোড় পর্যন্ত ঘুরিয়ে দেয়। আপনারা মনে রাখবেন, এর জন্য প্রয়োজন নেতাদের ধীশক্তি, বিচক্ষণতা, স্থিতপ্রজ্ঞ সহনশীলতা। কমরেড শিবদাস ঘোষ বলতেন, নেতা-কর্মীদের জীবন সংগ্রাম পরিচালনার ক্ষেত্রে এটা একটা নিরন্তর সংগ্রাম, যার মূল আধারটা হচ্ছে আদর্শগত সংগ্রাম। এই আদর্শগত সংগ্রামই নেতা-কর্মীদের রুচি, সংস্কৃতি, চারিত্রিক গঠন সব কিছু গড়ে দেবার চাবিকাঠি। এই সংগ্রামের বিরতি নেই। তিনি উপমা দিয়ে বলতেন, প্রতিদিন যেমন আয়নাটা পরিষ্কার না রাখলে তাতে ধূলো জমে, আর ধূলো জমলে প্রতিবিম্বটা বিকৃতরূপে প্রতিভাত হয়, তেমনই আমাদের এই আদর্শগত সংগ্রাম সঠিক পদ্ধতিতে নিরন্তর পরিচালনা করতে না পারলে, আমরা চাই বা না চাই, আমাদের মনের আয়নায় ধূলো জমবে। কাজেই এই সংগ্রামকে শ্লথ করা যায় না। এটাই হোক এবারের ৫ই আগস্টের সঙ্কল্প।

POSTAL REGISTRATION NO.
SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2004-06

R. No 5268 / 60

ইমরানার ঘটনায় মৌলবাদী ফতোয়ার বিরুদ্ধে

প্রধানমন্ত্রীর কাছে সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের খোলা চিঠি

ইমরানা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রীর কাছে গত ৯ জুলাই সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এক খোলা চিঠি পাঠানো হয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে —

অতি সম্প্রতি ঘটে যাওয়া উত্তরপ্রদেশের মজফ্ফরনগর জেলার চারথাওল গ্রামে একটি বর্বরোচিত ও লজ্জাজনক ঘটনার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মজফ্ফরনগরের বাসিন্দা মুসলিম রমণী ইমরানা বেগম তাঁর শ্বশুর আলি আহমেদ মহম্মদ-এর দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে বিচারের আশায় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টের দ্বারস্থ হন। কিন্তু ধর্মীয় সংগঠন দার-উল-উলুম, দেওবন্দ এই লজ্জাজনক ঘটনার জন্য দায়ী অপরাধী আলি আহমেদকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্তে 'ফতোয়া' জারি করে যে, ইমরানাকে তার স্বামী ত্যাগ করতে হবে এবং শ্বশুরের সাথে বসবাস করতে হবে। এই বর্বর ও অমানবিক 'ফতোয়া' ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে দেশের সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে বিস্মিত ও মর্মাহত করেছে। এই 'ফতোয়া'র ফলে ইমরানাকে এতদিনের প্রেম-প্রীতি-ভালবাসা দিয়ে গড়া স্বামী সংসার ও পাঁচ সন্তানকে ত্যাগ করে, সে যার লালসার শিকার সেই শ্বশুরের সাথে বাস করতে হবে। এইরকম একটি অমানবিক ও বর্বর 'ফতোয়া' সমস্ত ন্যায়-নীতি-মূল্যবোধকে পদদলিত করেছে ও মানবিক অধিকার লঙ্ঘন করেছে; শুধু তাই নয় নারীত্বের মর্যাদার উপর চরম আঘাত হেনেছে। এটা বিচারের নামে প্রহসন মাত্র। এধরনের একটি মধ্যযুগীয় 'ফতোয়া' কোন শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষই মেনে নিতে পারেন না।

আমরা সারা ভারত মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি এবং আমরা আশা করি দেশের সমস্ত গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণ, বিশেষভাবে মুসলমান সমাজের স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই এগিয়ে এসে নারীর মৌলিক অধিকার লঙ্ঘনকারী অমানবিক ও প্রতিক্রিয়াশীল এই 'ফতোয়া' তুলে নিতে বাধ্য করবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ্য ইতিপূর্বে ধর্মের নামে মৌলবাদী সংগঠনগুলির এইরকম বিভিন্ন সিদ্ধান্তের ফলে আমাদের দেশে বহু মেয়েকে অন্যায়ভাবে নানা সামাজিক অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছে এবং ঘৃণ্য অপরাধ করেও অপরাধীরা অব্যাহতি পেয়েছে। আজ তাই প্রয়োজন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এই ধরনের অমানবিক মধ্যযুগীয় 'ফতোয়ার' পরিবর্তন করা।

আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আপনার কাছে দাবি করছি, অবিলম্বে দেশের প্রচলিত ফৌজদারী দণ্ডবিধি অনুযায়ী ঘটনার বিচার করে অপরাধী ইমরানার শ্বশুর আলি আহমেদকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে এই ধরনের জঘন্য অপরাধ করার সাহস কারও না হয়।

আমরা আশা করব আপনি ব্যক্তিগতভাবে প্রকৃত ঘটনার তদন্ত সাপেক্ষে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করে দেশের সমগ্র নারী সমাজের মর্যাদা রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।

বাঙ্গালোরে
এ আই এম এস এস-এর প্রতিবাদ সভা

মৌলবাদী ফতোয়ার বিরুদ্ধে ১২ জুলাই কর্ণাটকের বাঙ্গালোরে এক প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়। উদ্যোক্তা ছিল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের বাঙ্গালোর জেলা কমিটি।

'আর ইমরানা নয়' নামাঙ্কিত এই প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন এ আই এম এস এস-এর বাঙ্গালোর শাখার সভানেত্রী প্রতিভা কুমারি। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন, প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট ও সমাজকর্মী হেমলতা মহিষী, সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রী ডঃ সুধা কামাথ, এ আই ডি এস ও বাঙ্গালোর সভানেত্রী জাহিদা শিরিন, এ আই এম এস এস-এর সাধারণ সম্পাদিকা ডঃ এইচ জি জয়লক্ষ্মী।

ডঃ জয়লক্ষ্মী বলেন, ধর্ষণের মতো একটি অপরাধকে আইনের সাহায্যে বিচার না করে যেভাবে ধর্মীয় ফতোয়া জারি করা হচ্ছে —বিচার ব্যবস্থার প্রতি তা এক বিদ্রূপ। বৃহৎ রাজনৈতিক দলগুলি যেভাবে ইমরানা ঘটনাকে ভোটব্যাঙ্ক গোছাতে কাজে লাগাচ্ছে তার নিন্দা করে তিনি বলেন, কংগ্রেস এই জঘন্য ঘটনা সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেনি। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মুলায়ম সিং যাদব ধর্মীয় ফতোয়াকেই সমর্থন করেছেন। আবার যে বিজেপি রাজস্থানে সতীদাহের মতো ঘটনার জয়গান করেছে, সেই বিজেপিই আজ ইমরানা বেগমের ঘটনায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করছে! এর বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তিনি মহিলাদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রখ্যাত লেখক-লেখিকা ও বুদ্ধিজীবীরা যে লিখিত বক্তব্য পাঠিয়েছিলেন, সভায় সেগুলি পাঠ করা হয়।

প্রবোধ পুরকাইতের বিধায়ক পদ

স্পিকার যা বলেছেন তা সংবিধানসম্মত নয়

— প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ গত ২৬ জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন ঃ

আপনারা জানেন, কুলতলি কেন্দ্রে এস ইউ সি আই বিধায়ক প্রবীণ কৃষক নেতা কমরেড প্রবোধ পুরকাইত ও দলের চারজন কর্মীকে কলকাতা হাইকোর্ট গত ২০ জুলাই যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় দেওয়ার পরই বিধানসভার স্পিকার মহাশয় প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ''রায়ের কপি হাতে পেলেই ওর বিধায়ক পদ খারিজ করে দেব।'' এই বক্তব্য বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে ও সংবাদপত্রে আপনারা দেখেছেন।

আমরা জনগণকে জানাতে চাই যে, ভারতীয় সংবিধানের ১৯২ ধারায় স্পষ্টভাবে বলা আছে, যে কারণে প্রবোধবাবুর বিরুদ্ধে হাইকোর্ট যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের রায় ঘোষণা করেছে, সেই কারণে বিধায়কের সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্ত, স্পিকার নয়, একমাত্র রাজ্যপালই নিতে পারেন। শুধু তাই নয়, এ-বিষয়ে রাজ্যপালকে ইলেকশন কমিশনের মতামত নিতে হবে এবং সেই মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। [3][192. Decision on questions as to disqualifications of members. — (1) If any question arises as to whether a member of a House of the Legislature of a State has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1) of article 191, the question shall be referred for the decision of the Governor and his decision shall be final.

(2) Before giving any decision on any such question, the Governor shall obtain the opinion of the Election Commission and shall act according to such opinion.]

আপনাদের অবগতির জন্য আরও জানাতে চাই, ভারতীয় জনপ্রতিনিধিত্ব আইনে একথাও বলা আছে যে, আদালত যদি কোনও বিধায়ককে দণ্ড দেয় তবে দণ্ডাদেশ ঘোষণার থেকে তিন মাস পর্যন্ত তার কোনও ফল বিধায়ক পদের ক্ষেত্রে বর্তাবে না। এই সময়ের মধ্যে যদি ওই দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল বা আবেদন করা হয় তবে ওই আপিলের নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিধায়ক পদ অটুট থাকবে। [3][(4)] Notwithstanding anything [4][in sub-section (1), sub-section (2) or sub-section (3)] a disqualification under either sub-section shall not, in the case of a person who on the date of the conviction is a member of Parliament or the Legislature of a State, take effect until three months have elapsed from that date or, if within that period an appeal or application for revision is brought in respect of the conviction or the sentence, until that appeal or application is disposed of by the court.] সুতরাং স্পিকার যা বলেছেন, সংবিধান তা বলে না।

দ্বিতীয়ত, এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয় আপনাদের আমরা জানাতে চাই। বিধায়ক প্রবোধ পুরকাইতের দণ্ডাদেশ প্রসঙ্গে জনসাধারণের অবগতির জন্য কিছু বক্তব্য সম্বলিত একটি প্রচারপত্র গত ২২শে জুলাই আমরা প্রকাশ করেছিলাম। কোন কোন মহল থেকে এই প্রচারপত্রটি সম্পর্কে ভুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানাতে চাই যে, দণ্ডাদেশ নিয়ে মহামান্য বিচারক বা বিচারব্যবস্থার প্রতি কোনও কটাক্ষ করার, অসম্মান দেখানোর এবং বিচারের প্রক্রিয়ায় কোন হস্তক্ষেপ বা অন্তরায় সৃষ্টির অভিপ্রায় বা উদ্দেশ্য আমাদের ছিল না, প্রচারপত্রের লক্ষ্যও তা ছিল না। বিচারব্যবস্থার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই হাইকোর্টের রায় সম্পর্কে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি।

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ স্মরণদিবস উপলক্ষে কলকাতার মহাবোধি সোসাইটি হলে, তাঁর চিন্তা সম্বলিত এক উদ্ধৃতি প্রদর্শনী ১-৩ আগস্ট আয়োজিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড প্রতিভা মুখার্জী।

অবাধে শ্রমআইন লঙ্ঘিত হয়

সাতের পাতার পর

এ আই টি ইউ সি-এইসব ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা কী করছে? তাঁরা বাস্তবে শ্রমিক স্বার্থরক্ষার কোন কাজ করছেন কী? বরং ঠিক উল্টোটাই করছেন।

আধুনিকীকরণের নামে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের মালিকী প্রস্তাবে নির্দ্বিধায় সই করে দিয়ে এসে শ্রমিকদের বোঝাচ্ছেন — খবরদার, আন্দোলন করো না, তাহলে বাকিদেরও ছাঁটাই করে দেবে। মজুরি কমিয়ে দিচ্ছে মালিক; চা-বাগানে প্রায় অর্ধেক মজুরিতে শ্রমিকদের খাটতে বাধ্য করা হচ্ছে। নেতারা টাকা খেয়ে মালিকদের প্রস্তাবে সই করে আসছেন; আর বাইরে এসে শ্রমিকদের বোঝাচ্ছেন, আন্দোলন করলে মালিক চা-বাগান বন্ধ করে দেবে, অতএব আন্দোলন নয়, বরং মালিক যা বলছে মেনে নাও। এই তো তাঁদের শ্রমিক স্বার্থরক্ষার চালচিত্র। গত ২৫ জুলাই চা-বাগান মালিকদের সঙ্গে যোগসাজসে তাঁরা যে চুক্তিতে সই করে এলেন এবং যা নিয়ে 'শ্রমিকদের জয়' বলে চতুর্দিক মুখরিত করছেন — তা আসলে শ্রমিক বঞ্চনা ও প্রতারণার চুক্তি। ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণী একমাত্র সংগঠন যারা এই বঞ্চনার চুক্তিতে সই দেয়নি, ঘৃণাভরে চুক্তিকে প্রত্যাখ্যান করেছে।

শ্রমিকদের তাই আজ সচেতনভাবে সেই শ্রমিক-সংগঠনের ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়াতে হবে, যারা মালিকের টাকায় চলে না, যারা মালিকের টাকা খেয়ে শ্রমিক আন্দোলনের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না, যারা শ্রমিকের বিক্ষোভ আন্দোলনকে মালিকের সঙ্গে বখরাবৃদ্ধির দর-কষাকষি হিসেবে ব্যবহার করে না, যারা মালিকশ্রেণী ও সরকারের আক্রমণ থেকে শ্রমিকশ্রেণীকে রক্ষার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে, প্রাণ দেয়, যারা পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী শোষণ শৃঙ্খল ভেঙে শ্রমিকশ্রেণীকে শোষণমুক্তির পথ দেখায়। তেমন শ্রমিক সংগঠনের নেতৃত্বে ইউনিয়ন গঠন এবং আন্দোলন গড়ে তোলা আজ শ্রমিকশ্রেণীর কাছে অত্যন্ত জরুরী।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ৩০৯৩৬৩৪৫, ২২৪৪০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ e-mail : suci_cc@vsnl.net Website : www.suci.in